KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78. X 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১৮/২ ১৮/৩ ১৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ, আশ্বিন ১৩৬৩ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩
	Condition : Brittle / Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

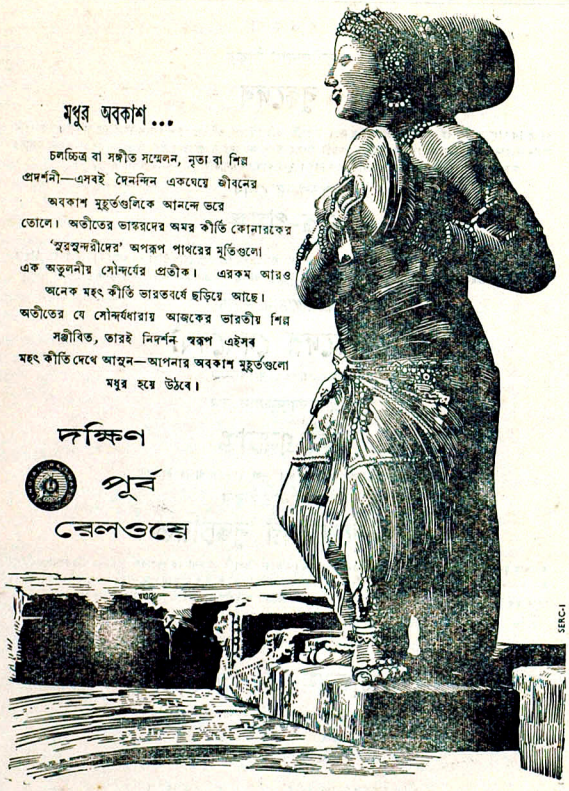

মধুর অবকাশ...

চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত সম্মেলন, নৃত্য বা শিল্প প্রদর্শনী—এসবই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের অবকাশ মুহূর্তগুলিকে আনন্দে ভরে তোলে। অতীতের ভাস্করদের অমর কীর্তি কোনারকের 'সুরসুন্দরীদের' অপরূপ পাথরের মূর্তিগুলো এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। এরকম আরও অনেক মহৎ কীর্তি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। অতীতের যে সৌন্দর্যধারায় আজকের ভারতীয় শিল্প সঞ্জীবিত, তারই নিদর্শন স্বরূপ এইসব মহৎ কীর্তি দেখে আসুন—আপনার অবকাশ মুহূর্তগুলো মধুর হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **স্বরূপ** মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ৩৩১

মণীন্দ্র রায় ॥ উদ্যোগের ইতিহাস ৩৩৮

মণীন্দ্র রায় ॥ দেখব, কী বাণী ৩৩৯

শামসুর রহমান ॥ কথার জন্যে ৩৪০

শামসুর রহমান ॥ খাদ ৩৪১

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ কবিতার বোঝাপড়া ৩৪২

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥ নটি ৩৫৫

অশোক মিত্র ॥ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা ৪০০

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ॥ চলচ্চিত্র ৪০৬

প্রমথনাথ বিশী ॥ আধুনিক সাহিত্য ৪০৮

সমালোচনা—অমলেন্দু দাশগুপ্ত, লীলা মজুমদার,
নৃপেন্দ্র সান্যাল, সুনীলকুমার নন্দী ও
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৪১৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

নিখুঁত মূর্তি গড়তে হলে

ভালো ভাস্করের খোঁজ পড়ে। তেমনি, কোনো কারণে স্বাস্থ্য যদি ভেঙে পড়ে, চিকিৎসার জন্য ভালো ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। আজকাল ভগ্নস্বাস্থ্যের একটি প্রধান কারণ দৈনিক জীবনসংগ্রামে যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, সেই অনুপাতে সঞ্চয়ের ভাগ কম। উত্তম আহার্যও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, কারণ শক্তিক্ষয়ের চেয়ে শক্তিসঞ্চয়ে সময় লাগে অনেক বেশি। এরই ফলে জীবন অবসাদক্লিষ্ট, দেহ নানা রোগের আধার হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় চিকিৎসক অনেক সময় একটি সারবান তেজোবর্ধক টনিক গ্রহণের উপদেশ দিয়ে থাকেন। ভিনকোলার কথা তাঁকে জিগগেস করে দেখবেন। সাধারণ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ— এই দুই প্রকার ভিনকোলা পাওয়া যায়।

ভিনকোলা

সারবান তেজোবর্ধক টনিক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ কলকাতা-১৪

PSSV 1

অষ্টাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

চতুরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর খানিকটা আলোচনা আগেই করেছি। সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে আমেরিকার বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে গিয়ে শিক্ষা নিয়ে এত আলোচনার কি প্রয়োজন তবে তার উত্তরে বলব যে শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই আমেরিকার বর্তমান বৈভব ও শক্তি গড়ে উঠেছে, আবার শিক্ষাপ্রণালীর দুর্বলতার ফলেই আমেরিকার সমাজজীবনের প্রধান প্রধান গলদগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই দোষে-গুণে আমেরিকার সমাজকে বুঝতে হলে আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালীর বিশদ আলোচনা করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে বিজ্ঞানকে এ-ভাবে প্রয়োগ আর কোন দেশ করেনি এবং তারই ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকা অর্থ, উদ্যোগ ও অস্ত্রশক্তিতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে যন্ত্র-সভ্যতা যে ভাবে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও তার তুলনা মেলে না। তবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাষ্ট্র এ বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমেরিকায় সমাজের সকল স্তরে সমতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকিরণে শিক্ষার যে দান সে কথার উল্লেখও আগেই করেছি। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে আমেরিকাবাসী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যে উৎকর্ষ সাধন করেছে, তার তুলনা বোধ হয় আর কোথাও মিলবে না।

আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি বড় দুর্বলতার জন্য যে সে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানত দায়ী সে বিষয়েও খানিকটা আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সুসংবদ্ধ ও ঐক্যীভূত নয় বলে জাতীয় চরিত্রগঠনে যথাযথ কার্যকরী হয়নি। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত নয় বলে কিশোর-কিশোরীদের জীবনে বহু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিশোর বয়সের অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম শিক্ষার কাজে পুরোপুরি নিঃশেষ হয় না বলে নানা কাজে অকাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়ন স্বদেশে যে শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করেছিলেন, তার ফলে ষোল সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীর বিষয় নির্বাচনে কোনই স্বাধীনতা থাকত না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই প্রত্যেকটি বিষয় প্রায় সমান মনোযোগ দিয়ে পড়তে হত বলে তাদের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ শিক্ষাকার্যে

নিবিষ্ট থাকত। কেবল যে বিবিধ বিষয় পড়তে হত, তা নয়, শিক্ষার মানকেও এত উঁচু করা হয়েছিল যে শিক্ষার্থীর পক্ষে গাফিলতি করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। বর্তমানে রুশ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাতেও নেপোলিয়নী শিক্ষাধারার অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাচুর্য এবং শিক্ষামানের কঠিনতার ফলে সোভিয়েট কিশোর-কিশোরী সারা মনপ্রাণ দিয়ে বিদ্যা অর্জন করতে বাধ্য হয়। সমস্ত সময় ও উদ্যম পড়ালেখার কাজে নিঃশেষ হয় বলে বিভিন্ন ধরনের দুষ্টামি, অনুশাসনহীনতা বা উচ্ছৃংখলতার অবকাশ বহুল পরিমাণে কমে যায়।

সে তুলনায় আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত অবনত বলে কিশোর-কিশোরীর সমস্ত সময় ও উদ্যম শিক্ষা-চেষ্টায় নিঃশেষ হয় না। আমেরিকার আবহাওয়ায় এমনিতেই সাফল্যের প্রতি ঝোঁক, তার উপরে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনে প্রায় অবাধ অধিকার এবং সর্বোপরি সে সমস্ত বিষয়ের যে মান, তা তাদের বুদ্ধি ও উদ্যমের তুলনায় সহজ বলে আমেরিকার কিশোর-কিশোরী স্কুল-কলেজের কার্যক্রমের বাইরে অপর্যাপ্ত সময় ও অবাবহৃত উদ্যমের প্রকাশ খোঁজে। তার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক বা সমাজবিরোধী কার্যক্রমের মধ্যেও তারা জড়িয়ে পড়ে। বিদেশীর চোখে কখনো কখনো আমেরিকার মাধ্যমিক ছাত্রসমাজের আচরণ বিসদৃশ লাগে—মাধ্যমিক শিক্ষার অবনত মান তার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই কেবল উচ্চশিক্ষার তাগিদে নয়, আমেরিকার সমাজজীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও তার মান বাড়াতে হবে এ-কথা আজকাল আমেরিকার প্রায় সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। দশ এগারো বৎসর বয়স থেকে সতেরো আঠারো বৎসর পর্যন্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের যে কার্যক্রম, তাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক উদ্যম ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হয় না। তাতে একপক্ষে বিদ্যালাভ বা জ্ঞানার্জনে আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা খানিকটা পিছিয়ে পড়ে এবং পরে কলেজে গিয়ে সে ঘাটতি পুরোবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। অব্যবহৃত শক্তি ও উদ্যম নানা অপ্রাসঙ্গিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ-সব কথাই জাতির পক্ষে বড় লোকসান। কিন্তু তার চেয়েও বড় লোকসান এই যে কৈশোরের আদর্শ-উদ্বেল বৎসরগুলির অব্যবহার বা অপব্যবহার হয় বলে বহু ছাত্র-ছাত্রীর মনে জ্ঞানান্বেষা বিকাশ লাভ করে না। নিয়মিত পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না। সাধনার ফলে চরিত্রে যে গভীরতা ও শক্তি আসে, তা আসে না। আমেরিকাবাসী সর্বদাই নতুনকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। তার ফলে যেমন উন্নতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়, অন্যদিকে চিত্ত ও চরিত্রে চপলতাও আসতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার গলদের ফলে বহু-ক্ষেত্রে সে ধরনের চপলতা জাতির জীবনে হানিকর হ'য়ে উঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কঠিনতর সাধনা করতে হ'লে সে সম্ভাবনা কমে আসবে। তরুণ বয়সে জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কঠোর সাধনা করতে হয়, তবে তার ফলে বহু অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হ'য়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যুবক-যুবতীর চরিত্রে এক নতুন দৃঢ়তা ও সুসংবদ্ধ শক্তি আসবে।

আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় সকলরকমের শ্রমের যে মর্যাদা তার উল্লেখ আগেই করেছি। তার ফলে বহু লক্ষ কিশোর-কিশোরী নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষার আয়োজন করে। এ ব্যবস্থা যে কি বিপ্লবকারী পরিবর্তন, একশো বছর আগেকার বিলিতি শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। সেকালে বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুরু করে কলেজে স্কুলে প্রায় সর্বত্রই দু'ধরনের শিক্ষার্থীর পরিচয় মিলত। একদলকে বলা হত ভদ্রকুলজাত ছাত্র; তারা সাধারণত ধনী পরিবার থেকে আসত এবং পারতপক্ষে নিজের হাতে

কোন কাজই করত না। আজ আশ্চর্য শোনাবে কিন্তু তখনকার দিনের বিলিতি সমাজে যারা জীবনে কোন প্রয়োজনীয় কাজে কোনদিন হাত লাগায়নি, তাদেরই ভদ্রলোক বলা হত। বাকি থাকত স্বপরিশ্রমনির্ভর ছাত্রছাত্রীদের দল কিন্তু স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই তাদের খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখত। আজকাল অবশ্য বিলাতে এ-ব্যবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে এবং ধনী ও দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হ'তে বসেছে। আমেরিকার ছাত্রসমাজে এ-রকম শ্রেণীবিভাগ কোনো কালেই দেখা দেয়নি। সে দেশেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য রয়েছে এবং একশো বছর আগে সে তফাৎ ইউরোপের চেয়ে কম ছিল না। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমেরিকায় দরিদ্র ছাত্র সামাজিক কোন অমর্যাদা ভোগ করেনি। বরং স্বকীয় পরিশ্রমে নিজের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করায় সমাজের চোখে সম্মানার্হ পরিগণিত হয়েছে।

শ্রমের মর্যাদাবোধের এটা হলো লাভের দিক কিন্তু দুনিয়ায় কোন জিনিষই অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ নয়। তাই শ্রমমর্যাদাবোধের একটা ক্ষতির দিকও আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে। স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়েরা নিজের পরিশ্রমে নিজের শিক্ষার অর্থ উপার্জন করবে, সমস্ত ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে শিখবে—প্রথম দৃষ্টিতে এ-ব্যবস্থা সবারই ভালো লাগবে, কিন্তু তার ফলে অত্যন্ত অল্প বয়সের শিশুরাও টাকা-পয়সা সম্বন্ধে যে ভাবে সচেতন হয়ে উঠে, তাকে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করা চলে না। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সর্বব্যাপী এবং অবৈতনিক। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে লেখাপড়া শিখবার জন্য ছোট ছেলেমেয়ের অর্থ উপার্জনের কোন প্রয়োজন নেই। তখনো কিন্তু তারা পকেট-খরচা হিসাবে বাড়ি থেকে যা বরাদ্দ তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য নানা ধরনের কাজ খোঁজে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজ বিলি করে, বিক্রী করে, কখনো দোকান থেকে চকোলেট কিনে তা খুচরোভাবে সওদা করে, এবং এমনি নানা উপায়ে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে সুরু করে। ফলে বহুক্ষেত্রে অত্যন্ত অল্প বয়সে অর্থোপার্জনের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দেয়, খুব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও মেতে উঠে যে কি ভাবে দু-পয়সা আয় করবে। বাইরের কাজে পয়সা কামানোর প্রবৃত্তি সব সময়ে সফল হয় না, তখন বাড়ির কাজের জন্যও তারা বাপ-মার কাছে পয়সা দাবি করতে সুরু করে। বহু পরিবারে দেখেছি যে মাকে ঘরকরনার কাজে সাহায্য করবার জন্য ছেলে-মেয়ে পয়সা পায়। বাড়ির বাগানে ফুলগাছের তদারক বা বাড়ির উঠোনে ঘাস কাটা, আগাছা পরিষ্কারের জন্যও বাঁধা হারে মজুরী দেবার রীতি রয়েছে। আমেরিকান দুয়েকজন বন্ধু এ-ব্যবস্থার সমর্থনে বলেছেন যে বাইরের লোক দিয়ে এ-রকম কাজ করাতে হলে যখন বাপ-মার পয়সা খরচ হত, তখন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সে কাজ মুফতে কেন করবে? তাঁরা এ-কথাও বলেন যে এভাবে প্রথম জীবন থেকেই শিশুরা একপক্ষে শ্রমের মর্যাদা শেখে, অন্যপক্ষে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হয়। শুধু তাই নয়, তারা এ-কথাও শেখে যে আরাম বা আনন্দ করতে হ'লে যে অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ নিজের পরিশ্রমেই যোগাড় করতে হবে, বিনামূল্যে কোন জিনিষই জীবনে মিলবে না।

এ-সব কথা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু শিশুবয়সে টাকা-পয়সা সম্বন্ধে বেশি সচেতন হ'লে জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এ-কথাও স্বীকার করতে হবে। বিশেষ ক'রে বাড়িঘরের কাজকর্মে টাকা-পয়সার লেনদেনে পারিবারিক জীবনের ভিত্তি টলে যায়। শিশুর জন্য মায়ের যে ভালোবাসা ও সেবা, টাকা-পয়সা দিয়ে তার মূল্য

নিরূপণ করা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনিভাবে বাপ-মার জন্য সন্তানের ভালোবাসা ও সেবাও অর্থনিরপেক্ষ। রান্নাঘরে মা যখন কাজ করে, তখন স্বামী-সন্তানের কল্যাণের জন্যই তার আগ্রহ। তার পরিশ্রমের আর্থিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে এবং ইচ্ছা করলে ঘণ্টা হিসাবে তার মেহনতের মূল্য নির্ণয়ও করা চলে, কিন্তু কোন পরিবারের গৃহিণীই খালি টাকা-পয়সার হিসাবে নিজের সংসার পরিচালনা করেন না। ছেলে-মেয়েরা বাড়ির কাজ করবে, বাপ-মাকে সাহায্য করবে, ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করবে—এটা তাদের সহজ এবং স্বাভাবিক পারিবারিক দায়িত্ব। শিশুবয়স থেকেই এ-দায়িত্ব যদি তারা আনন্দে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে, তবে স্বজনপ্রীতি কমে যায় এবং পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হ'য়ে পড়ে। এমনিতেই বর্তমানের শিল্পপ্রধান সমাজে পারিবারিক সম্বন্ধ লোপ পেতে বসেছে। ব্যক্তি দিন দিন বেশিরকম আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠছে। তার উপর যদি শৈশব-বয়স থেকেই তারা পরিবারের স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের বদলে অর্থোপার্জনের ভিত্তিতে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সুরু করে, তবে তার ফলে যে পরিবার ও সমাজ টলে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেবল আমেরিকা ব'লে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগে বিবাহ-বন্ধন সহজেই ভেঙে পড়ছে, যৌথপরিবার তো প্রায় অন্তর্হিত। ছোট ছোট পরিবারের মধ্যেও আগেকার মতো নিবিড় সংযোগ নেই। পারিবারিক জীবনের এ-সংকোচন ও বিলোপের ফলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, আমেরিকাতেই সেগুলি বেশি স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়, এবং শৈশবজীবনে পারিবারিক কর্তব্য-পালনের ক্ষেত্রেও অর্থের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন যে তার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

বাড়ি-ঘরের কাজ-কর্মের জন্যও টাকা-পয়সার লেনদেনের ফলে যে কেবল পারিবারিক জীবনের হানি হয়েছে, তা নয়। মানবতার মূল্যবোধও তার ফলে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রয়োজনের জগতে মানুষে এবং পশুর মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। জীবনের দাবি মেটাবার পরে উদ্বৃত্ত উদ্যম এবং শক্তির ব্যবহারেই মানুষ সমস্ত পশু থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশও এই অপ্রয়োজনের ক্ষেত্রে। পাঠ্য-অপাঠ্য পুথিপত্রের মধ্যে অবাধ বিচরণ অথবা শিল্পকলা সাহিত্য সংগীতের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ তাই মানুষের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুতপক্ষে প্রয়োজনের বাইরের জন্য যে জগৎ, সেই জগতকে চেনা এবং জানা মানুষের মনুষ্যত্বের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মানুষের সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান এবং আদর্শবাদ প্রয়োজনের জগতের তাগিদকে অস্বীকার ক'রে গড়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে অর্থকরী বিদ্যা একান্তভাবে প্রয়োজনের জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই অর্থ-সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন হ'লে মানবজীবনের মূল্যবোধের হানি হ'তে বাধ্য। যে সমাজে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও অর্থ উপার্জনের জন্য আগ্রহী, সেখানে যে শৈশব থেকেই মূল্য-বোধের বিকৃতি ঘটতে পারে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।

অর্থোপার্জনের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে অধ্যয়ন অধ্যাপনার প্রকৃতিও বদলায়। শৈশব থেকে ছাত্র অর্থকরী বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং যে সমস্ত বিষয়ের কোন সাক্ষাৎ অর্থকরী প্রতিশ্রুতি নেই, সেগুলিকে অবহেলা করতে চায়। অথচ জাতির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ-সমস্ত বিষয় বা বিদ্যাকে উপেক্ষা করা চলে না। অর্থসর্বস্ব সমাজে অন্যভাবেও বিদ্যাবত্তার প্রতি অনুরাগ খানিকটা কমে যায়। ইউরোপের বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য এই যে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে যে পড়াশুনা হয়, ছুটির সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তার

চেয়ে বেশি পড়বে। এক কথায় ছাত্রজীবনের মেয়াদ যতদিন থাকে, ততদিন ছুটি-অছুটির বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। ছাত্রদের জীবনের প্রধান করণীয় কাজ অধ্যয়ন। ভারতবর্ষের পুরাতন ঐতিহ্যেও অধ্যয়নকে তপস্যা ব'লে স্বীকার ক'রে ছাত্রদের অন্য সমস্ত কর্ম থেকে বিমুখ করবার চেষ্টা হয়েছে। আমেরিকায় কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা দিয়েছে। কলেজের শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, অনেক সময়ে তাদের উপরে সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। কাজেই তারা যদি পড়া-লেখার চেয়ে অর্থোপার্জনের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবে তাতে আশ্চর্য হবার ততটা কারণ নেই। কিন্তু স্কুলে পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও যদি সমস্ত অবসর সময় অর্থের ভাবনায় কাটায়, সমস্ত উদ্যম দিয়ে অর্থোপার্জনকে এত বড় ক'রে দেখে, সেটা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনের তাগিদে যে-সব কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী অবসর সময়ে টাকা রোজগার করে নিজেদের পড়া-লেখার খরচ যোগায়, তাদের কথা আলাদা। সাধারণত তাদের চরিত্রবল এত বেশি, পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও আগ্রহ এত প্রবল যে অর্থোপার্জন ক'রেও তারা ঠিকঠিক পড়া-লেখার কাজ চালিয়ে নিতে পারে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় তা ঘটে না। সচ্ছল পরিবারের কিশোর-কিশোরী যখন খেয়ালের বশে বা কোন বিলাস-বাসনা পূর্ণ করবার জন্য সমস্ত অবসর অর্থোপার্জনে ব্যয় করে, তখন তাদের পাঠজীবনের হানি হ'তে বাধ্য। দর্শনের বা পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছুটির তিন চার মাস অধীত বিদ্যাকে অধিক আয়ত্ত করবার বদলে যদি হোটেলে গিয়ে রেকাবী বাসন ধোয়, তবে তার ব্যক্তিগত রুজি বেড়ে যায়, কিন্তু জাতীয় জীবনের দিক থেকে তাতে সমাজের ক্ষতি না লাভ সে বিষয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

শ্রমের মর্যাদাবোধ এবং সর্বব্যাপারে সাফল্যলাভের সাধনা আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের দুটি মহৎ গুণ, কিন্তু এ-দুটি গুণের বিকৃতির ফলেই শিক্ষাব্যবস্থায় এ নূতন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আবার শিক্ষাব্যবস্থায় এ-রকম বিকৃতি দেখা দিয়েছে ব'লেই জাতীয় চরিত্রে অবনতির লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতপক্ষে যেন-তেন প্রকারে সাফল্যলাভ করবার সাধনা কোন কোন ক্ষেত্রে এত উগ্র হ'য়ে উঠেছে যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সাফল্য বিচারেও অর্থসম্পদের মানদণ্ড এসে পড়ে বলে সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে উঠে। সবাই চায় যে বেশি অর্থ উপার্জন করবে—এ-রকম চাওয়াতে অন্যায় কিছু নেই—কিন্তু যখন সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র হ'য়ে উঠে তখনই নানা বিসদৃশ ব্যাপার দেখা দেয়। মনে হয় যেন একজন অপরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অর্থোপার্জনে লেগেছে, প্রচুর অর্থ যদি আসে, তবে কি উপায়ে এল তা নিয়ে বেশি ভাবনার প্রয়োজন নেই।

যেমন ক'রেই হোক আর্থিক ব্যাপারে সাফল্যলাভ করতে হবে এই মনোবৃত্তি থেকেও নূতনের প্রতি মোহ জন্মে। সবাই যা করছে, তা-ই করলে সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না। এবং তা করতে না পারলে আর্থিক সফলতা লাভ কঠিন হবে। তাই আমেরিকার বহু তরুণ-তরুণী নূতন কিছু করবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র। যাই করি না কেন, সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে—এ মনোভাব আমেরিকায় যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বোধ হয় অন্যত্র তার এত বেশী পরিচয় মেলে না। বিজ্ঞাপনের যে বাহুল্য আমেরিকায় প্রায় সমস্ত আগন্তুকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কারণও এই মনোবৃত্তির মধ্যেই মিলবে। শুধু তাই নয়, তাক লাগাবার চেষ্টায় এ-সব বিজ্ঞাপন কোন কোন ক্ষেত্রে রুচি ও শালীনতার সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তার জন্য যদি সমাজ,

নীতি ও কল্যাণের হানি হয়, তবে তা করতেও বহু লোক পরাঙ্মুখ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সকলের সমর্থন চাই, সমাজের কাছে সমাদর চাই। এই দোটানার ফলে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সবাই নূতন কিছু করতে চায়। বিজ্ঞাপনের আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির মধ্যে একপক্ষে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রকাশের তীব্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উৎকট আগ্রহ। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমেরিকায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিনিঃসঙ্গতার ভীতি যে-রকম প্রবল, একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও তা দেখিনি।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। একপক্ষে আমেরিকায় প্রত্যেক নরনারী স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করতে চায়। নিজস্ব অধিকারে সফল ও সার্থক হ'তে চায়। অর্থোপার্জনে ও যশোলাভে বিশিষ্ট হ'তে চায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর এত ঝোঁক দেওয়ার ফলে আমেরিকায় পারিবারিক জীবনের বন্ধনও খানিকটা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। অন্য-পক্ষে আমেরিকায় নরনারী যেভাবে সবাই মিলে-মিশে থাকতে চায়, কেউ অন্যের থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন পরিগণিত হ'তে ভয় করে, তা-ও না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। স্কুলের ছেলেরা একই ধরনে চুল কাটে—কদমছাঁট চুল দেখেই বোঝা যাবে যে এরা স্কুল-কলেজের ছাত্র। স্কুলের কোন বিশেষ উর্দি নেই। কিন্তু তবু সবাই প্রায় একই ধরনের পোষাক পরবে, একই ধরনের কথা বলবে, চিন্তার ক্ষেত্রেও সবাই একই ধরনের পথ অবলম্বন করতে চাইবে। সাধারণ আমেরিকানের পক্ষে একা থাকার মতন এত বড় শাস্তি বোধ হয় আর কিছুই নেই। ইংরেজ নিজের খবরের কাগজ, নিজের পাইপ, নিজের কুকুর বা নিজের বাগান নিয়ে থাকতে পারলেই তুষ্ট। আমেরিকান কিন্তু দশজনে মিলে গল্পগুজব, আড্ডা, হল্লা না করতে পারলে অস্বস্তি বোধ করে। বিদেশী যারা এসে আমেরিকায় প্রথম বসতি পাতে, তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বহুক্ষেত্রে বাঁচিয়ে রাখে, নিজেদের ঐতিহ্য সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে থাকে। স্বতন্ত্র হ'তে তাদের কোন ভয় নেই। এক পুরুষেই পালা একেবারে উল্টে যায়। কিভাবে পিতৃপুরুষের দেশের স্মৃতি ভুলে মনে-প্রাণে আমেরিকান হবে এই হয় তাদের ছেলে-মেয়েদের একমাত্র সাধনা। বহু পুরুষ ধরে তারা আমেরিকান নয়, সে-কথা টের পায়, এই তাদের সবচেয়ে বড় ভয়। বস্তুতপক্ষে পোষাকে-আষাকে, পান-ভোজনে, কথাবার্তায়, চিন্তা-ভাবনায় আমেরিকান যেভাবে যূথধর্মী, পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশেও একমাত্র কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তার নজির মিলবে না।

পূর্বেই বলেছি যে দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ-ধরনের সমীকরণ বা চরিত্র-সাদৃশ্য বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য আর কোন দেশে দেখা যায় না। আমেরিকা এবং রুশদেশে যে এ-ধরনের চরিত্রসাদৃশ্য দেখা যায়, তার কারণ আছে। দুটি দেশেই যন্ত্রসভ্যতার চরম বিকাশ জাতীয় জীবনের লক্ষ্য। দুটি দেশেই সমস্ত মানুষকে প্রায় একই ছাঁচে ঢেলে গড়বার চেষ্টা। রুশদেশে মার্ক্সবাদের লৌহকাঠামোর মধ্যে সকলের মানসিক ছাঁচ গড়ে উঠে, তার ব্যতিক্রম করা ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক। আমেরিকায় রাষ্ট্র ভয় দেখায় না, বাধ্য করে না, কিন্তু সকলের জন্য প্রায় একই ধাঁচের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সকলের একই সামাজিক লক্ষ্য ব'লে সেখানেও বেশিরভাগ নরনারী সমাজধর্মের ব্যতিক্রম করতে চায় না। যন্ত্রসভ্যতার প্রবণতার ফলেও পরস্পরের সাদৃশ্য বেড়ে যায়। যন্ত্রের ধর্মই এই যে একই রকম বহু জিনিষ তৈরী করবে। সংখ্যায় তারা বহু, কিন্তু প্রকৃতিতে তারা এক। আমেরিকায় এবং আজকাল রুশদেশেও যন্ত্র মানুষের খোরাক জোগায়, পোষাক তৈরী করে, ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে। ফলে একই ধরনের খোরাক খেয়ে সকলের একই ধরনের

রুচি গড়ে উঠে। সবাই একই রকম পোষাক পরে, একই রকম বাড়িতে থাকে। সমস্ত জীবনের ধাঁচ এক ব'লে তাদের মনের ধাঁচও যে এক হবে, চিন্তায় ঐক্য ও সাদৃশ্য আসবে, তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে?

[ক্রমশঃ]

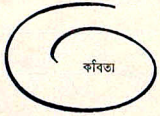

উদ্যোগের ইতিহাস

মনীন্দ্র রায়

মাঘের সকালে তাজা রোদ
কাছিমের পিঠ মেলে আধোডোবা নৌকোর গলুইয়ে
প'ড়ে থাকে, পৃথিবীর ইচ্ছার ভিতর।

আমি তার ব্যাকরণ বুঝিনি এখনো।
সুখের মুহূর্তগুলি প্রায়-বোবা প্রেমিক-প্রেমিকা—
নিশ্বাসে, নীরবতায়, চোখে চোখে কথা বলে যায়,
বাঘের থাবায় আমি খুঁজিনি সে হরিণের স্বাদ।

বরং নিজেই কতো অবুঝ খাঁচায়
টিয়ার চীৎকারে দিন কাটিয়েছি, তার
পাখার ঝাপট মনে আসে।
স্মৃতির নদীতে আজো দেখি বারে বারে
যখনি জালের শব্দ ছেঁড়ে অন্ধকার,
লাফানো মাছের তীক্ষ্ণ আতঙ্কের রেখা জ্বলে ওঠে।

তা-ব'লে আনন্দ কিছু পাইনি, তা নয়।
মাঘের সকালে আমি কাছিমের ব্যাকুলতা নিয়ে
এ জগৎ পান করি রৌদ্রের গেলাসে।
তবু সে রভস ভুলি প্রতিদিন। ঠিক যেন তুমি!
যতোক্ষণ কাছে পাই, হীরকের স্তব্ধ অনুভূতি—
দূরে গেলে সব শূন্য, আবার প্রস্তুতি॥

দেখব, কী বাণী

মণীন্দ্র রায়

বরং সহিষ্ণু হও—
বলেছিল রাত্রির আকাশ।
বরং প্রতীক্ষা কর—
গাছের আড়ালে পাখী, যুবতীর মন, শস্য, নদী
বারে বারে বলেছে জানি তা।

পতনের হিংস্র মজা পায়ে পায়ে রুখে
আমি তাই সার্কাসের দড়ির খেলায়
কাটালাম দীর্ঘ দিন।
চড়ুইয়ের শান্তি নিয়ে ধুলোর গোষ্পদে
সেজেছি পাখার ক্লান্তি।
গাধার চীৎকারে তবু কেন
শূন্য আজ ভেঙে পড়ে কাঁচের টুকরোয়?

জলের দু'হাত দূরে মাছরাঙার মতো
থরোথরো পাখা নেড়ে স্থির হ'তে চেয়ে
কবে আর লক্ষ্যে যাব?
রক্তে যে রোদের স্বপ্ন মুছে মুছে আসে!
ধৈর্য আজ কাপুরুষ, প্রতীক্ষা নির্বোধ।
সুপক্ক ফলের মতো জীবনকে মুঠি ভ'রে নিয়ে
দেখব, কী বাণী তার শাঁসে॥

কথার জন্যে

শামসুর রহমান

তা হ'লে কী করি?
একটি কথার জন্যে ভেবে মরি সারাক্ষণ, অথচ কথার
অন্ত নেই বিশাল ত্রিলোকে, প্রাণবন্ত শত কথা
—ব্যথার কান্নার জলে ভেজা,
অব্যক্ত আনন্দে আভাময়—
শুধু কথা ফোটে চিরকাল। এই মাটির সংসারে
নিতান্ত যে আটপৌরে লোক,
তারও চোখ দীপ্ত হয় কথার অনলে।
পথে-ঘাটে, গঞ্জে কি বাজারে
হাজারে হাজারে তারা ধ্বনিময়। শ্রুতির জানালা খুলে রাখি।

কথা,
গাছের পাতার মতো সহজ-সবুজ;
কথা,
রহস্যের মেঘে-ঢাকা;
কথা,
তত্ত্বের ঘোরালো
আবর্তের মতো
নিষ্ঠুর-কুটিল;
কুমারীর কণ্ঠে-জাগা কুহকিনী কথা আছে,
আছে অফুরন্ত সাধ; আর আছে কথা
কবির চৈতন্যলোকে সুপ্ত, স্তব্ধ প্রতীক্ষায়।

শুধু তাকে বলা যায়—এমন কথার সাড়া নেই
অসংখ্য কথার ভিড়ে, হাটে-মাঠে। যেখানেই থাক
আসে না সহজে তারা এই অন্তর্লোকে॥

খাদ

শামসুর রহমান

সেখানে গভীর খাদ আছে এক কুটিল, ভয়াল :
অতিকায় সিংহের হাঁ-য়ের মতো প্রসৃত শূন্যতা
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত তা'র, আদিগন্ত বিভ্রমে বিহ্বল।
অতল গহ্বরে সেই আছে শুধু পাঁক, পুঞ্জীভূত
আবর্তিত ক্রুদ্ধ স্ফীত ক্রূর অন্ধ পাঁক, শুধু পাঁক।
আকাঙ্খিত ফুল দল, লতাগুল্মে, পদ্মের মৃণাল
অথবা অপ্রতিরোধ্য পিচ্ছিল শৈবাল, এমনকি
গলিত শবের কীট, কৃমিপুঞ্জ—ঘৃণিত, জটিল—
কিছুই জন্মে না তাতে, মৃত্যু ছাড়া জন্মে না কিছুই।

অপটু ডানার শীর্ণ পাখির শাবক, বুড়ো কাক,
মাঠের নিরীহ গরু, দিনান্তের তৃষিত মহিষ
অথবা চিকণ মৃগ, কিছুই হয়না প্রত্যাখ্যাত
অতল গহ্বরে সেই। অতর্কিতে হয়তো কখনো
বিভ্রান্ত পথিক কোনো রাত্রির মোহিনী অন্ধকারে
পাঁকের আবর্তে ডোবে নিরুপায়, ব্যর্থ আর্তনাদ,
তিলে তিলে নিমজ্জন, যথারীতি অন্তিমে বিলোপ।

এবং আমিও আজ নিমজ্জিত অন্তহীন খাদে।
দুর্গন্ধের সুতীব্র পীড়নে রাত্রিদিন বিভীষিকা
সমপরিমাণে; ক্রমাগত কেবলি জড়াই পাঁকে।
নিঃশ্বাসে নরক ফোঁসে, আমার অধীর আত্মা সে-ও
গরলের বিন্দু হ'য়ে ঝরে সারাক্ষণ, আর দেখি
আকাশে নক্ষত্রগুচ্ছ, আমি শুধু মরালের মতো
অন্তিম গানের ধ্যানে প্রজ্জ্বলিত, গুঞ্জরিত খাদ॥

কবিতার বোঝাপড়া

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতা পড়ে কেউ যখন বলেন 'বুঝি না', ঠাট্টা ক'রে বলা যায়— পাঠকের গায়েও আধুনিক কবিদের হাওয়া লেগেছে! নইলে বুঝিয়ে না ব'লে 'বুঝি না' ব'লে হেঁয়ালি করার কী মানে?

'বুঝি না' কথাটার তো অনেক রকম মানে হয়।

'স্পষ্ট নয়'; 'পছন্দ নয়'; 'স্পষ্টও নয়, পছন্দও নয়'; 'স্পষ্ট বটে, তবে পছন্দ নয়'; 'পছন্দ বটে, তবে স্পষ্ট নয়'—'বুঝি না' ব'লে এর যে কোন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে।

কেউ যখন বলে, 'অমুককে আমি দেখতে পারি না'—বক্তা যে নিজের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আপশোস করছে না তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। 'দেখতে চাই না' ব'লেই 'দেখতে পারি না'। তা'হলে কি পাঠকের 'বুঝি না' বলা থেকে 'বুঝতে চাই না' এই অর্থটাই ধরতে হবে?

কথায় আছে, যে চালাক সে চোখ টিপলেই বুঝতে পারে, আহাম্মক বোঝে ঠেলা দিলে।

'বুঝি না' ব'লে পাঠক চোখ টিপছেন। ঠেলায় পড়বার আগেই আধুনিক কবিকে বুঝে নিতে হবে।

আসলে আজকের লেখক আর পাঠকের মধ্যে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি আছে। দুপক্ষকে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আসা দরকার। মাঝখানে মান অভিমান যেন বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়।

কবিতার দু দিকে দুটো ডানা। একদিকে লেখক, অন্যদিকে পাঠক। কোন একটা ডানা কাটা গেলে কবিতার আর ওড়া হয় না।

কী লেখক কী পাঠক, একের অন্যকে না হ'লে চলে না। লেখা মানেই কথা বলা। কবিতাও কথা বলারই একটা ধরন। না বললে যেমন কথা হয় না, তেমনি না শুনলেও কথা হয় না।

যখন মুখে কথা হয় তখন বক্তা আর শ্রোতা থাকেন মুখোমুখী। দু'জনেই দু'জনকে দেখতে পান। কিন্তু লেখার বেলায় ব্যাপারটা উল্টে যায়। লিখতে লিখতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সামনে না দেখতে পেয়ে লেখক ভেবে বসেন বুঝি শুধু নিজের জন্যেই তিনি লিখছেন। তেমনি পাঠকের কাছেও মনে হয় লেখাটা বুঝি আকাশ থেকে পড়েছে।

আসলে বলবার সময় বক্তা আর শ্রোতা মুখোমুখী সম্পর্কে আসেন। কিন্তু লিখবার সময় তাঁদের পিঠোপিঠি সম্পর্ক। লেখক আর পাঠক পরস্পরের পেছনে পড়ে যান। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সম্পর্কটা ঘোচে না।

কিন্তু সম্পর্কটা শুধু লেখক 'আর' পাঠকের নয়, লেখক 'বনাম' পাঠকের। সম্পর্কটা শুধু সহযোগিতার নয়, প্রতিযোগিতারও বটে।

দুটো দল খেলতে নেমে একদল হ'য়ে যায় না। কেন না, তা হ'লে খেলা আর খেলা থাকে না। পরস্পরের প্রতিপক্ষ হ'লে তবেই খেলা হয়। এ ওকে বাধা দেয়। বাধা দেওয়া আর বাধা ঠেলে ফেলা এরই ভেতর খেলা জমে ওঠে।

খেলার নিয়ম থাকে। সেই নিয়ম মেনে নিয়ে নিয়মের মধ্যে থেকে দু'দলকে পরস্পরের সঙ্গে যুঝতে হয়। এ ওর সঙ্গে যুঝবে, গোড়া থেকেই দু'দলের মধ্যে এই রকমের একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া থাকে। প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে দু'দল পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সহযোগিতার ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। দু'দল একই খেলার অংশীদার হয়।

সব খেলারই একটা আরম্ভ আর শেষ থাকে। পুরো সময় খেলতে হয়। পুরো সময় বলতে একটানা বেদম খেলে যাওয়া নয়। খেলা চলতে চলতে মাঝে মাঝে থমকে থমকে দাঁড়ায়। একচলে আগাগোড়া চলে না, চাল বদ্‌লে বদ্‌লে যায়। খেলা তাতে ঝিমিয়ে পড়ে না। বেগ বাড়ে।

নিয়ম মেনে খেলা। কিন্তু নিয়মের কাজ শুধু বেঁধে দেওয়া নয়। বেঁধে ছেড়ে দেওয়া। ছেড়ে দিয়ে বাঁধা। 'না'র সঙ্গে যেন 'হাঁ' থাকে। তা নইলে খেলা আর না-খেলা সমান হ'য়ে যায়।

নিয়ম ভাঙবার পণ ক'রে কেউ খেলতে নামে না। খেলতে খেলতে নিয়ম ভেঙে গেলেও তেমনি খেলা চটে যায় না। নিয়ম ভাঙলে কমবেশি শাস্তি পেতে হয়। নিয়ম ভাঙা যদি রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা'হলে খেলাই ভেস্তে যায়।

লেখার ভেতরেও নিরন্তর এই টানাপোড়েনের খেলা চলে। কিভাবে চলে একটু উঁকি দিয়ে দেখা যাক।

লেখাও একরকমের কথা বলা।

যখন আমি নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি, সেই কথার নাম ভাবনা। যখন মনের কথাটা মুখ ফুটে বলি তখনই সেটা অন্যের কানে যায়।

আরেকভাবেও কথাটা কানে তোলা যায়—মুখে বলার বদলে যদি লিখি। লিখে কোন কথা সরাসরি কানে তোলা যায় না। আগে চোখের কাছে হাজির করতে হয়। চোখ দিয়ে ধরে তারপর কানে তুলতে হয়।

আপনমনে যখন আমি কথা বলি, তখনও পুরোপুরি আমি একা নই। একটা মন দুটো হ'য়ে, শুধু একের হ'য়ে নয় অন্যের হ'য়েও, পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লেগে যায়। যখন আমি নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি, আমার মন তখন বক্তাও বটে, শ্রোতাও বটে। শুধু বলে না, শোনেও। শুধু শোনে না, বলেও। তাই একা বসে যখন আমি ভাবি, বাকি মানুষদের তখনও আমি ছেড়ে থাকি না। আমার ভাবনাটা শুধু একতরফা বলা হয় না—তার মধ্যে শোনা থাকে, বিচার থাকে, আলোচনা থাকে। মনের মধ্যে তোলপাড় হয়।

মনের অন্য নাম বিবেক। 'বিবেক' মানেই হলো বাদ-বিসম্বাদের ভেতর দিয়ে সত্যে পৌঁছনো। গ্রীক 'ডায়ালেগো' শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত 'বিবেক' শব্দের এদিক থেকে আশ্চর্য মিল। এ-ও প্রতিধ্বনি নয়, প্রতিবেশী।

যখন আমরা দু'জনে কথা বলি, তখন বক্তা আর শ্রোতা দু'জন লোক। শোনাতে শোনাতে আর শুনতে শুনতে নিজের কথাগুলোকে বোঝাবার মতো ক'রে নিই। ভাবি আর বলি, বলি আর ভাবি। শ্রোতাকে মনের ভেতরে নিয়ে ভাবি। শ্রোতাকে মনের বাইরে রেখে বলি। পরস্পরকে এমন একটা জগতের মধ্যে বেঁধে ফেলি, যে জগৎটা দু'জনেরই

চেনা-জানা। যা আছে তাই শুধু মনে করিয়ে দিই না, যা আছে তাই দিয়ে যা সম্ভবপর তা গড়ে নিতেও বলি। শুধু পুরনো কথা নয়, নতুন কথাও বলি।

লিখতে গিয়েও মনের কথা বাইরে আনি। যখন লিখি তখনও আসলে কথা বলি। হরফের আকারে মুখের কথাগুলো সাজাই।

শব্দ চোখে দেখা যায় না, কান দিয়ে শুনতে হয়। অথচ হরফের সাজ পরিয়ে শব্দগুলোকে আমরা চোখেরই সামনে ধরি। চিনতে পেরে চোখ তাড়াতাড়ি কানকে ডেকে দেয়। পড়া ব্যাপারটা এমন পড়ি-মরি ক'রে হয় যে দেখে মনে হয় চোখকে দিয়েই বুঝি কানের কাজটাও করিয়ে নেওয়া হলো। আসলে চোখের কাজ চোখ করে, কানের কাজ কান করে। যার যে কাজ তাকেই সেটা করতে হয়।

লেখায় শব্দগুলো আসে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে। চেনা দেখলে তবেই তারা ধরা দেয়। মুখ খোলে।

'ক' একটা চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। তবু মনে মনে পড়লেও তার ভেতর 'ক'-এর আওয়াজ পাই।

'ক'-এর আওয়াজ 'ক' দাগটার মধ্যে আছে কি? তা যদি থাকত তাহলে চোখ বুজে লেখাটা সোজা কানের কাছে ধরলেই হতো। আর তাহলে হরফ চেনবারও দরকার পড়তো না।

গ্রামোফোনে পিন দিয়ে না বাজালে রেকর্ড থেকে যেমন আওয়াজ বেরোয় না, তেমনি চেনা চোখ দিয়ে বাজিয়ে নিলে তবেই হরফ থেকে শব্দ বেরোয়।

শব্দ ধরবার আরও উপায় আছে। যেমন অন্ধেরা ফুটকিওয়ালা লেখা পড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে।

হরফের সঙ্গে আওয়াজের, দেখা বা ছোঁয়ার সঙ্গে কানে শোনার নেহাৎই পাতানো সম্পর্ক। প্রকৃতির মধ্যে এই সম্পর্ক নেই। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে মানুষ এই সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

লেখার সমস্ত মাল-মশলা মানুষ নিরক্ষর প্রকৃতির কাছ থেকেই পেয়েছে। মানুষ শুধু তাকে নিজের ছাঁচে ঢেলেছে। ছাঁচগুলো সবই মানুষের মন-গড়া। 'ক' চিহ্নের সঙ্গে 'ক'য়ের আওয়াজ কোন স্বাভাবিক সূত্রে বাঁধা নয়। সূত্রটা সামাজিক।

সামাজিক সূত্রে বাঁধা প'ড়ে তবেই লেখার হরফ চোখে-কানে কথা বলে। চিহ্নের সঙ্গে শব্দের তখন এমন ভাব হ'য়ে যায়, নিজেদের তারা এক ব'লে ভুল করে। কখনও কখনও তারা এমন ভাব করে যেন প্রকৃতির কাছ থেকেই তারা এসেছে, যেন লেখার পেছনে মানুষের কোন হাত নেই।

চাক্ষুষ লেখার ভেতর দিয়ে শব্দ আসার ফলে শব্দ আর শুধু কানে শোনার জিনিস হ'য়ে থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তাতে চোখও ভাগ বসাতে চায়। লেখা পড়বার সময় পাঠক আর শুধু কথা বলার শ্রোতা নয়, শ্রোতাকে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও হ'তে হয়। লেখার জগৎ আর কথা বলার জগৎ এক থাকে না।

কথা বলার মধ্যেও শ্রোতা শুধু শ্রোতা থাকেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দর্শকও হ'তে হয়। বক্তা তো শুধু কথা বলেন না, হাত মুখ নেড়ে সেই সঙ্গে ইশারাও করেন। তাঁর সব কথা শুনে ধরা যায় না, দেখেও ধরতে হয়।

কিন্তু লেখায় হাত-মুখ নেড়ে ইশারা করা যায় না। আবার একেবারে ইশারা না ক'রেও পারা যায় না। ছেদ, মাত্রা, দাঁড়ি, কমা দিয়ে পাঠককে নিছক দেখাই। শোনা বন্ধ রেখে তখন দেখতে হয়। পাঠক তখন শ্রোতার বদলে হন নিছক দর্শক।

এইভাবে দেখা আর শোনার মধ্যে যেমন কথা বলায়, তেমনি লেখায় একটা বোঝা-পড়া থাকে। এক সঙ্গে চোখ-কান খাড়া রেখে যেমন পড়তে তেমনি শুনতে হয়।

লেখার রাজ্যে এসে একটা মুস্কিল বাধে। লেখায় শব্দগুলো আওয়াজ হিসেবেই আসে সত্যি, কিন্তু শব্দকে আসতে হয় হরফের মূর্তি ধরে। লেখায় শব্দ নিরাকার নয়, শব্দ সাকার। তাই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছবি হওয়ার দিকে শব্দগুলোর ঝোঁক দেখা যায়। শব্দগুলো সবাক ছবি হ'তে চায়।

কিন্তু এ মুস্কিল কথা বলার মধ্যেও থাকে। কথা শুধু আওয়াজ নয়, সুর তোলে। বলতে গিয়ে কথা গেয়ে ওঠে।

বক্তা আর শ্রোতা হ'য়ে দু'জন যখন কাছাকাছি আসেন তখন কথা বলায় দু'জনেরই সায় থাকা দরকার। কারো শোনবার দুটো কান আছে ব'লেই যখন-তখন যে সে তাকে যা-তা কথা শোনাবে তা চলে না। বললেও তা কানে ঢুকবে না। কানে ঢুকলেও কথা হবে তখন কতকগুলো ফাঁকা আওয়াজ।

কথার মধ্যে কিছু পদার্থ থাকা দরকার। কথা জিনিসটা নেহাৎ অপদার্থ হ'লে চলে না। বক্তা যে জিনিস শ্রোতাকে কথার ভেতর দিয়ে দেবেন তা শ্রোতার কাছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিস হ'লে চলবে না। তাই ব'লে শ্রোতা যে শুধু ইঁট-কাঠ-জল-মাটি, শুধু আকাট বস্তুকেই ধরা-ছোঁয়ার জিনিস ব'লে মনে করেন—তা নয়। ভালো-খারাপ, ছোট-বড়, কম-বেশি, স্থান-কাল, ভূত-ভগবান, সুখ-দুঃখ—এইসব মাপ, মায়া, আন্দাজগুলোও শ্রোতার ধরা-ছোঁয়ার জিনিস হ'য়েই থাকে।

মানচিত্রের ভেতর দিয়ে ছোট্ট জায়গার মধ্যে গোটা পৃথিবীকে যেমন ধরে দেওয়া যায়, তেমনি শব্দের মধ্যে গোটা পৃথিবীটাকে আঁটিয়ে দেওয়া যায়।

পৃথিবীকে মানচিত্রের মধ্যে ধরা যায় ব'লে মানচিত্রকে সত্যিকার পৃথিবী ব'লে ভুল করা ঠিক নয়। সত্যিকার পৃথিবীটা মানচিত্রের বাইরে। কেউ যদি পৃথিবীর জল-মাটিতে হাত ঠেকাতে চায় তাহলে তাকে মানচিত্রের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানচিত্র শুধু কাগজে এঁকে পৃথিবীর একটা ধারণা দেয়। ছোটোর মধ্যে পৃথিবীকে মেপে দেয়।

ক্যামেরায় যদি আমি পাহাড়ের একটা ছবি তুলি সেটা হবে এইটুকু। অতটুকু পাহাড় দেখে কেউ যদি ব'লে বসে, 'ওটা পাহাড়-ই নয়, কেন না পাহাড় হ'লে ছবিটা তো পাহাড়ের সমান হতো'।

কিন্তু সমান মানে কখনই দুটো এক হওয়া নয়।

আপনার পকেটে টেক্কা-মার্কা দেশলাই আছে, আমার পকেটেও টেক্কা-মার্কা দেশলাই আছে। মার্কা দুটো সমান। তাই ব'লে বলা যাবে না আপনার দেশলাইটা আমার পকেটে আছে, কিংবা আমারটা আপনার পকেটে আছে। আপনার পকেটের দেশলাই আমার পকেটের দেশলাইয়ের সঙ্গে মিলে গিয়ে দুটো এক দেশলাই হ'য়ে গেল, তাও সম্ভব নয়।

দু'জনের দুটো দেশলাই; শুধু মার্কার দিক থেকে এক।

এক টাকার নোট দিয়ে আমি চার আনা দামের চারটে সন্দেশ পেতে পারি। এক টাকায় চারটে সন্দেশ মিলছে ব'লে এ কথা বলা যাবে না—এক টাকার একটা নোটও যা, চারটে সন্দেশও তাই। ময়রার দোকানে টাকা দিলে তবে চারটে সন্দেশ মিলবে। সন্দেশটা পেতে গেলে টাকাটা ছাড়তে হবে।

টাকা দিয়ে শুধু সন্দেশ কেন আরও পাঁচটা জিনিস কেনা যায়। একটা টাকার মধ্যে এতগুলো জিনিস তাদের মান খুঁজে পাচ্ছে। টাকাটাই তাদের মান-সম্মান দিচ্ছে। যত বেশি জিনিস ধরতে পারছে টাকারও ততই মান বাড়ছে।

মান বা মাপ জিনিসটা মনের। মনের বাইরে না এলে তা দিয়ে কোন কাজ হাসিল করা যায় না। কাঠির গায়ে যখন মাপটা ধরে দিই, তখনই সেটা হয় মাপকাঠি। সেই একই মাপ যখন ফিতের মধ্যে ধরি সেটাও মাপকাঠিই হয়।

মাপের কোন নিজস্ব আকার নেই। অনেকটা জলের মতো। যখন যার মধ্যে রাখা যায়, তখন তারই গড়ন নেয়। মাপটা যে যার খুশিমতো ধরলে চলবে না। সবাই একই মাপকাঠি দিয়ে মাপবে। কেউ পাঁচ কড়ায় গণ্ডা গুণবে, কেউ গুণবে তিন কড়ায়—তা চলবে না।

শব্দ তেমনি মনের মাপ। টাকার মতোই শব্দটাকে বাইরে এনে ফেলা যায়। তখন সেটা পড়া কিংবা শোনা যায়। ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে বলতে পারলে শব্দ দিয়ে আমি জিনিসও পেতে পারি। 'এক গ্লাস জল দাও' বললে এক গ্লাস জল মেলে।

কাজটা কথার জোরে হচ্ছে বটে, কিন্তু শুধু কথার জোরে নয়। কথা ছুটে গিয়ে জল গড়িয়ে আনছে না। কথা আসলে জিনিস নয়, কাজ বাগিয়ে আনছে। যাকে বলছি, কথাটা তার কানে যাচ্ছে। 'জল' শব্দটা থেকে জল জিনিসটা সে ভাঙিয়ে নিচ্ছে। তারপর জল গড়িয়ে দিচ্ছে। জল পাবার আগে কথা ব'লে শ্রোতার মন পেতে হলো।

শব্দগুলো রকমারি জিনিসে বোঝাই হ'য়ে থাকে। যাকে দেওয়া হচ্ছে সে শব্দটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে যখন যে জিনিসটা দরকার বাছাই ক'রে বুঝে নেয়।

শব্দগুলোর সঙ্গে পরস্পরের চেনা-জানা থাকলে তবেই কথা ব'লে পরস্পরের মন জানাজানি সম্ভব। শব্দগুলো ভারি মুখচোরা। তাদের তাড়িয়ে বড় জোর শ্রোতার কান পর্যন্ত পাঠানো যায়। কিন্তু মন পর্যন্ত পাঠানো যায় না।

প্রেমিক প্রেমিকারা ভ্রূকুটি করবেন জেনেও একথা না ব'লে উপায় নেই যে, মন-দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা একেবারেই একটা মিছে কথা।

একজনের মন, একজনের ভাব আরেকজনকে দেওয়া যায় না।

শব্দটা আমার নিজের নয় কিন্তু শব্দের সঙ্গে যে বিশেষ ভাবগুলো লেগে থাকে সেগুলো আমার নিজের দেখে-শুনে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া।

'মানুষ' বললে আমি গরু বুঝি না; সেটুকু হুঁশ আমার আছে। 'মানুষ' বলতে মানুষ জাতটাকেই আমি বুঝি।

কিন্তু 'মানুষ' বলতেই একটা বিশেষ মানুষ আমার মনের সামনে ভেসে ওঠে। 'মানুষটার গোঁফ আছে, শার্টের হাতা গোটানো—হাতে একটা শক্ত লাঠিও আছে'। জানি এইটুকু শুনেই রাজ্যের মেয়েরা আর তার সঙ্গে পাঞ্জাবী-পরা গোঁফ-দাড়ি কামানো পুরুষরা দল পাকিয়ে হৈ-হৈ ক'রে তেড়ে আসবে। তারা ধমক দিয়ে বলবে, 'কী? আমরা মানুষ

নই?' এ রকম একটা কঠিন পাল্লায় পড়তে হবে তা বলতে বলতেই আঁচ করেছিলাম। তাই মনের মানুষটার নিরস্ত্র হাতে ভয়েভয়ে তাড়াতাড়ি একটা শক্ত লাঠি গুঁজে দিয়েছিলাম।

কিন্তু 'মানুষ' ভাবতে গিয়ে টেকো আর বাবড়ি চুল, খালি চোখ আর চশমা-পরা চোখ, কালো আর ফরসা, উদো আর বুধো সব যদি একাকার হ'য়ে যায়—সেটাই বা কী জাতের মানুষ হবে?

যখন কবিতা লেখা হয়, নিরাকার নির্গুণ মানুষে কাজ হয় না। কবিতার জন্যে চাই গুণধর মানুষ। সে মানুষ এমন হবে যাকে ধরা-ছোঁয়া যাবে। নিদেনপক্ষে একটা ঠুঁটো জগন্নাথ কিংবা তালপাতার সেপাই হ'লেও চলবে।

জীবাণু আমার কাছে থেকেও নেই। কিন্তু সূর্য ঠায় মাঝখানে থাকলেও আমি যে দেখতে পাই পুব দরজা খুলে সূর্য রোজ ওঠে।

আমি যেমন পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তেমনি অন্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষভাবেই দেখাতে চাই। কবিতার জগতে সব কিছুরই হয় গড়ন নয় স্বাদ, হয় রং নয় গন্ধ, আছে—সব কিছুই ধরা ছোঁয়া যায় ব'লেই পৃথিবী শুধু পৃথিবী নয়, পৃথিবী ধরণী।

পৃথিবীকে ধরি, পৃথিবীকে ছুঁই শুধু ধরা-ছোঁয়ার জন্যে নয়। বাসনার হাতে ধ'রে-ছুঁয়ে পৃথিবীকে বদলাই। সব কিছু আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সরিয়ে নড়িয়ে দিই। তোলপাড় করি। পৃথিবীর কাছে শুধু চাই না—পৃথিবীকেও দিই একটি স্পন্দমান হৃদয়।

জীবনের ডালে কবি নাড়া বাঁধে। আকাঙ্ক্ষাগুলোকে উঁচুতে টাঙিয়ে গান গেয়ে গেয়ে দোল দেয়।

কবি কেমন ক'রে দেখে? যেমন ক'রে সবাই দেখে।

বনের ভয়-পাওয়া পশুরাও জানে—না নড়লে কিছু দেখা যায় না। তাই হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে মড়ার মতো চুপচাপ পড়ে থাকে। নড়ে না; পাছে দেখা যায়।

এক জায়গায় ঠায় থাকলে দেখা যায় না। ঠাঁই নাড়া হ'লে তবেই দেখা যায়। পাঁচটা জিনিসের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকলে বাঁধনটা খুলতে হয়। তুলে আনতে হয়। ছাড়াতে হয়। আলগা ক'রে আলাদা ক'রে দেখতে হয়।

কিন্তু শুধু বাঁধন খোলা নয়, নতুন ক'রে বাঁধা। শুধু পাঁচটা জিনিসের মধ্যে থেকে তোলা নয়, পাঁচটা জিনিসের মধ্যে ফেলে দেখা। শুধু একা করা নয়, এক করা। তফাৎ ক'রে মেলানো।

কবি তোলপাড় ক'রে দেখে। সব কিছুই তাকে নেড়েচেড়ে দেখতে হয়।

পৃথিবীতে কিছুই এক জায়গায় বসে নেই। সমস্ত পৃথিবী আনচান করছে নিজেকে দেখাবার জন্যে। সমস্তই বদ্‌লে বদ্‌লে নিজেকে দেখাচ্ছে।

বস্তু যখন নিজেকে ছেড়ে বাঁধে, আর বেঁধে ছাড়ে,—তখন টান লাগে। সেই টানই হলো মন। তখন নিজের মুকুরে নিজেকে দেখতে পায়। মুচড়ে মুচড়ে ওঠা। ব্যথায় টনটন করা। সেই হলো দেখা। মনের কাজই হলো দেখা। টান না থাকলে দেখা হয় না। মন তাই নিরন্তর টানে।

নদী যেতে যেতে নিজেকে দেখায়। শুধু দেখায় না, শব্দ ক'রে ক'রে দেখায়। মাটির সঙ্গে নিজেকে বাধিয়ে বাধিয়ে, বাজিয়ে বাজিয়ে দেখায়।

বাঁধা থাকলে তাতে আওয়াজ থাকে না। দীঘির বাঁধা জল নিস্তব্ধ নিথর। থেমে

থাকলে আওয়াজ নেই। চললে তবেই নদী গেয়ে ওঠে।

নদী নড়ে নড়ে নিজেকে দেখায়। নিনাদিত হ'য়ে নিজেকে দেখায়। দেখানো আর শোনানো একই সঙ্গে চলে।

আলো তরঙ্গিত হয় ব'লেই আমরা দেখি। ধ্বনি তরঙ্গিত হয় ব'লেই আমরা শুনি।

একই গতির মধ্যে দৃশ্য আর শব্দ এ ওকে ধ'রে ধ'রে এগোয়। কখনও একা হয়। কখনও এক হয়। ঝেঁকে ঝেঁকে চলে। এ ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে এ ওকে টানে।

সব কিছুই এমনি এক অস্থির উচাটনের মধ্যে নিজেকে টান ক'রে দেখায়। ওঠা আর পড়ার মাঝখানে উত্তাল হ'য়ে ঢেউ নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। ঠায় থাকে না, ঠাঁই-নাড়া হ'য়ে সরে সরে থাকে। থেকে থেকে ওঠে, থেকে থেকে পড়ে। ওঠা আর পড়ায় দ্বিধা হ'য়ে ঢেউ দুলে দুলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলে।

থাকা বলতে থাক-থাক হ'য়ে, একের পর এক হ'য়ে থাকা। নিজেকে কেবলি নয়-নয় ক'রে বারে-বারে নতুন হওয়া। নিজেকে 'না' 'না' ক'রে একই ঢেউ নিজেকে নানানখানা ক'রে তোলে।

ঢেউ পড়বে ব'লেই ওঠে। পড়ে গিয়ে ফের ঠেলে ওঠে। বার-বার একই জায়গায় উঠে-পড়ে ঢেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাল ঠোকে না। তালে তালে চলে। চরকির মতো পাক দিয়ে দিয়ে ফেরে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ছকে সব কিছু বাঁধা। ছকই হলো গতি। তাই কোন বস্তুই নিছক নয়।

এই ছকটারই অন্য নাম ছন্দ। সারা পৃথিবীটাই ছন্দে বাঁধা। সূর্যের চারপাশে, নিজেকে বেড় দিয়ে নিপুণ হ'য়ে ঘোরে ব'লেই পৃথিবীতে বসন্ত আসে, পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। ছন্দের জোরেই পৃথিবী প্রাণ পায়।

বস্তু সব সময় নিজেকে চালাচালি করে। বীজ ফাটিয়ে, অঙ্কুর হ'য়ে, ডালপালা মেলে আকাশে মাথা তুলে, পাতার আড়ালে ফুল ফুটিয়ে—এমনিভাবে গাছ নিজেকে নেড়ে নেড়ে দেখায়। তারপর একটা সময় আসে, গাছ নিজেকে ফুরিয়ে ফেলে। বাড়তে বাড়তে বাড়ন্ত হ'য়ে যায়। তার আগে আশে-পাশে বীজ ছড়িয়ে দেয়। একটি বীজ বেড়ে অনেকগুলো বীজ হয়। একটি গাছ থেকে অনেক গাছ। একসঙ্গে অনেক হলে গাছ আর নিছক গাছ থাকে না—নতুন সম্বন্ধের মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে দিয়ে গাছের দল তখন অরণ্য হ'য়ে ওঠে।

বিষম নাড়া খেয়ে খেয়ে সমুদ্রের গর্ভে হয়েছে প্রাণের জন্ম। বস্তু যখন বাইরের নাড়াটাকে ভেতরে আনে, তখনই বস্তুর মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগে। পৃথিবীতে দেখা দেয় স্পন্দমান প্রাণ।

প্রাণ পাবার মধ্যে মানুষের কোন হাত ছিল না। কিন্তু প্রাণে যে মন লেগেছে, তাতে পুরোপুরি মানুষেরই হাত। 'মানুষ' তাই একটা নেহাৎ নাম নয়। 'মানুষের' মধ্যে 'মন'—এই কৃতিত্বটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রাজা-রাজড়ার মতোই 'মানুষ' আমাদের খেতাব হ'য়ে উঠেছে।

প্রাণ যেমন বস্তু-ছাড়া নয়, মনও তেমনি বস্তু-ছাড়া নয়। আসলে মন জিনিসটা বস্তুরই একটা বড় রকমের চাল।

যখন বস্তু প্রাণ পায়, পৃথিবীর সঙ্গে বাঁচার সম্বন্ধে আসে। বাঁচার মধ্যে থাকে চাওয়া। প্রাণীর সঙ্গে প্রকৃতির তখন চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক।

পৃথিবী এতদিন শুধু চরাচরের মধ্যে ভাগ হয়ে ছিল। প্রাণ এসে জড়বস্তু থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে পৃথিবীকে নতুন ক'রে ভাগ করলো।

গোড়ায় ছিল গাছ হ'য়ে শুধু এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে চাওয়া। আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে, জল-মাটিতে শেকড় চালিয়ে বাঁচার জন্যে উসখুস করা।

তারপর পোকা-মাকড় পশু-পাখি হ'য়ে সুরু হলো চেয়ে-চিন্তে বেড়ানো। ঠাঁই-নাড়া হয়ে প্রকৃতির গায়ে গা ঠেকিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় নেওয়া।

চাওয়া-পাওয়ার এই সম্পর্ক নিয়ে মানুষও পৃথিবীতে এল। কিন্তু নিছক চেয়ে থেকে কিংবা নেহাৎ চেয়ে-চিন্তে বেড়িয়ে মানুষের বাঁচা চললো না। প্রকৃতিকে মানিয়ে নিতে হলো। প্রকৃতির সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার নতুন সম্বন্ধ পাতিয়ে মানুষ পৃথিবীকে নতুন ক'রে ভাগ ক'রে নিল।

খালি হাত প্রকৃতির গায়ে সোজাসুজি ঠেকানো নয়, হাতিয়ার লাগিয়ে পৃথিবীকে ঠিকঠাক করা। হাতিয়ারটা হলো হাতের ঠেকো। বলা যায়, বাড়তি হাত।

পৃথিবীকে ঠিক করতে গিয়ে মানুষ নিজেরও ঠিক পেল। প্রকৃতিকে বাগ মানাতে গিয়ে মানুষ নিজেকেও বাগ মানালো।

বাঁচতে গেলে চাওয়া আর পাওয়াকে এক করতে হয়। চাহিদা আর জোগান মিলে গেলে তবেই লেন-দেন চালু থাকে। ঘরে কুঁজোভর্তি জল আছে; তেষ্টা পেলে তখনই জলের খোঁজ পড়ে। বাকি সময়টা জল যেন থেকেও থাকে না।

বাঁচার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের অনবরত লেন-দেন হচ্ছে। চাওয়া আর পাওয়া দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে তার একটানা বোঝাপড়া চলেছে। প্রকৃতিকে দিয়ে মানুষ তার অভাব মিটিয়ে নেয়।

প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর ভাব, আমার মধ্যে বস্তুর অভাব। হাত বাড়িয়ে হাতিয়ার দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে অভাবটাকে ফেলতে হয়। তার ফল হিসেবে প্রকৃতির ভাবটুকু আমার মধ্যে আসে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এমনি একটা লেন-দেনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে যেমন প্রকৃতিকে তেমনি মানুষকে কিছুটা ছাড়তে-নিতে হয়। তখন আগের অবস্থাটা বদলে যায়।

আগে ছিল : প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর ভাব, মানুষের মধ্যে বস্তুর অভাব। এবার হয় : মানুষের মধ্যে বস্তুর ভাব, প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর অভাব।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে : গাছে ফুল ফুটে আছে, ফুলটা আমার চাই। তখন গাছের মধ্যে ফুলের ভাব, আমার মধ্যে ফুলের অভাব। গাছ থেকে ফুলটা তুলে আনতেই আগের অবস্থাটা বদলে গেল। তখন আমার মধ্যে ফুলের ভাব, গাছের মধ্যে ফুলের অভাব।

যা—চাই, তাই দিয়েই মানুষ পৃথিবীকে যাচাই করে। মানুষের চাওয়াটাই হলো মানুষের মাপকাঠি।

গোড়ায় বস্তুই ছিল বস্তুর ভাব। ফুল হ'য়ে থাকাটাই ফুলের ভাব।

মানুষের হাত ধরে যখন মন এল, তখন পৃথিবী শুধুই মানুষে-অমানুষে ভাগ হলো না। একটা পৃথিবী মনের গুণে দুটো হলো।

বস্তু আর ভাব আলাদা হ'য়ে গেল। একই বস্তু তখন 'বস্তু' আর 'বস্তু'র ভাব হ'য়ে দু'জায়গায় থাকল। মনের বাইরে আর মনের ভেতরে। বাইরের জগতে হাতের ধরা-ছোঁয়ার

মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বস্তুটা ধরা থাকল, মন সেই বস্তুটাকেই আবার মুখের কথা দিয়ে বেঁধে ভাব হিসেবে নিজের জগতে ধ'রে রাখল।

কিন্তু ভাব আর অভাবের সম্পর্কটা ঘোচে না। 'জল' শব্দটা যখন জলের ভাব নিয়ে আমার মনে থাকে, তখন জলের ভাবটা হয় জল বস্তুটার অভাব। আবার জল বস্তুটা 'জল' শব্দের মধ্যে ধরা না পড়ে যখন প্রকৃতির কোলে থাকে তার মধ্যে মনের ভাবের অভাব ঘটে।

ভাব আর অভাব এ ওকে আঁকড়ে ধরে থাকে। একই জিনিস একাধারে ভাব, একাধারে অভাব হয়; একবার ভাব, একবার অভাব হয়। ভাবের মধ্যেই থাকে অভাব; অভাবের মধ্যে ভাব। ভাব থেকে অভাবের, অভাব থেকে ভাবের দিশে পাওয়া যায়।

মনের সঙ্গে বস্তুর এই চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক নিয়েই মানুষ প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ায়। শুধু চোখ মেললে চলে না; তাক ক'রে তাকিয়ে দেখতে হয়। চেয়ে দেখলে, দেখার সঙ্গে চাওয়া মেলালে, তবেই ঠিক ক'রে দেখা হয়।

চোখ দেখে জাল ফেলে' ফেলে'। একটা গণ্ডি দিয়ে আগে ঘিরে নেয়। তারপর জালটাকে যত গুটিয়ে আনে গণ্ডিটা ছোট হয়। চোখ যত বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই দেখুক, ছোট্ট একটা গণ্ডি থেকেই যায়।

আশপাশসুদ্ধ আকাশটাকে বাদ দিয়ে নির্ভেজাল চাঁদ দেখাতে হলে অর্জুনের মত টিপ হওয়া দরকার। চাঁদ যদি কাঠের পাখি হতো, তা-ও না হয় কথা ছিল।

কিন্তু চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি আকাশটাকেও দেখি। চাঁদকে আমিও টিপ করি। কিন্তু অন্য রকমের টিপ। এ টিপ কপালে থাকে। আকাশটা কপালের মতো মনে হয়।

কিন্তু চাঁদকে আমি সেই একবারের দেখা অচেনা চাঁদ ক'রে রাখি না। আকাশ থেকে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনি। ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি না। আমার ছোট্ট মেয়েটার শিয়রে ব'সে সকাল-সন্ধ্যে ডাক দিই—

আয় চাঁদ আয়—
খুকুর কপালে টিপ দিয়ে যা॥

টিপ দিতে ব'লে খোদ চাঁদটাকেই খুকুর কপালে বসিয়ে দিই। সেই সঙ্গে খুকুর কপালে এক টুকরো আকাশও ঠেকিয়ে দিতে ভুলি না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রথম যে কে কার কপালের টিপ দেখেছিল, এখন আর সে খবরই কেউ রাখে না। কপালটা যে মানুষের তাতেও সন্দেহ নেই। টিপটা হয়তো সিঁদুরের কিংবা কাঁচপোকার। কোন না কোন টিপ কারো না কারো কপালে। সেই দেখাটা ছড়ার মধ্যে ধরা পড়ে সমানে নিজেকে নেড়ে নেড়ে যাচ্ছে।

হাতে যা ঠেকে তাই যেমন আমরা হাতে তুলে নিই না, চোখে যা ঠেকে তাই তেমনি আমরা আদেখ্‌লের মতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিই না। দেখার মধ্যেও থাকে বাদছাদ। গুচ্ছের মধ্যে দেখলেও একটি একটি ক'রে তুলে বেছে দেখি।

চোখ চুপচাপ দেখে। মনই তার কানে কানে কথা ব'লে চিনিয়ে দেয়। ওটা মেঘ, এটা মাটি, ওটা চলছে, এটা থেমে আছে। ওটা ছায়া, এটা আলো। ওটা শক্ত, এটা নরম। ওটা দূর, এটা নিকট। ওটাতে আওয়াজ আছে, এটা স্তব্ধ। ওখানে গন্ধ আছে, এখানে গন্ধ নেই।

শুধু দেখা নয়, কান পেতে, হাতে-পায়ে ধরে ছুঁয়ে, জিভ ঠেকিয়ে, নাকের কাছে এনে দেখা। শুধু চোখ দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখা। চোখের যা অভাব মনই তা মিটিয়ে দেয়।

চোখ যেমন ইশারায় শুনে নেয়, কানও তেমনি আড়ি পেতে দেখে নেয়। পায়ের শব্দে বুঝি, মানুষ না জন্তু। শুধু রূপ নয়, স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শও শব্দের মধ্যে ধরে দিই। আকার বুঝিয়ে দিই 'প্র-কা-ণ্ড' আর 'ছোট্ট' ব'লে। 'টক-টক', 'ভ্যাপসা-ভ্যাপসা', 'খশখশে' ব'লে স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শের আদল দিই।

মুখের কথা তাই সশব্দও বটে, সচিত্রও বটে। চেনা মানুষ হ'লে ডেকে ডেকে চেনা পৃথিবীটাকে দেখিয়ে-শুনিয়ে দেয়।

কবির কোন আলাদা সৃষ্টিছাড়া জগৎ নেই। যে জগতের সঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কে এসে মানুষ জীবনকে ফুটিয়ে তোলে, সকলের সেই চাওয়া-পাওয়ার জগৎটা নিয়েই কবিরও ব্যস্ততা। মুখের যে কথাগুলো পৃথিবীকে মেপে মেপে দেখায়-শোনায় সেই কথা নিয়েই কবির কারবার। প্রকৃতির সঙ্গে দলবদ্ধ মানুষের অবিরাম যে বোঝাবুঝি চলেছে, কবি দলছাড়া হ'য়ে সেই লড়াই থেকে স'রে থাকে না।

পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেই মানুষে-মানুষে বোঝাপড়া ক'রে নিতে হয়। কথা তাই শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়ে শেষ হয় না, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পাতায়।

এই বোঝাপড়াটা হলো চাওয়া-পাওয়া নিয়ে। প্রকৃতি যা হাতে তুলে দেয় তা দিয়ে মানুষের চলে না। তাই জোর ক'রে কেড়ে-কুড়ে নিতে হয়। তাতেও চলে না। তখন মানুষ বসে প্রকৃতির ওপর কারিকুরি ফলাতে।

বাঁচাটা আর নিছক বাঁচা থাকে না। যেমন তেমন বস্তু হ'লে চলে না। মনের মতো জিনিস হওয়া চাই। বস্তুর মধ্যেও মানুষ মনটাকে ঢুকিয়ে দেয়। মানুষের হাতে পড়ে আসল বস্তু হ'য়ে ওঠে বানানো জিনিস। জিনিসটাকে দুবার ক'রে হ'তে হয়। একবার মনের মধ্যে। একবার মনের বাইরে। একবার চাওয়া হ'য়ে, একবার পাওয়া হ'য়ে। যে জিনিসটা হয়, তাতে শুধু হাতেরই কারিকুরি থাকে না, মনেরও কারিকুরি থাকে।

যা আছে তাতে চলে না। প্রকৃতিকে মানুষ ঢেলে সাজে। সাজ বদলে প্রকৃতিকে নতুন হ'তে হয়।

মানুষের মনের সাজঘরে প্রকৃতিকে আগে সাজিয়ে নেওয়া। হাতে পাবার আগেই মনের মধ্যে পাওয়া চাই।

মনের নিজের কোন মাল-মশলা নেই। প্রকৃতির ভাঁড়ার থেকেই সব কিছু ধার করতে হয়। মন পাকা রাঁধুনি বটে, কিন্তু তরিতরকারী মশলাপাতি হাতাখুন্তি সবই বস্তুজগৎ থেকেই নিতে হয়। সব তুলে-বেছে এক জায়গায় ক'রে যে রান্নাটা সে ধরে দেয়, তার স্বাদ মাথা কুটলেও প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যাবে না।

হাত-ই শুধু কাজ করে তা নয়। মনও কাজ করে। কিন্তু মনের কাজটা সরাসরি হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না। হাত চালিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। মন কাজ ক'রে ভাবনার ভেতর দিয়ে। ভাবনা মানেই হওয়ানো। মন করে কাজের কাজ। হাতের কাজের আগে মনের কাজ।

কবিতাও কাজ ছাড়া কিছু নয়। সটান কাজ নয়, কাজের জন্যে কাজ। হাতের কাছে নক্‌শা ফেলে দেওয়া। যাতে সেই মতো কাজ হয়।

মানুষের কাছে জীবন বলতে চাওয়া আর পাওয়া। কিন্তু পাওয়াতেই শেষ নয়। পাওয়ার পর আবার চাওয়া। কেবল চেয়ে চেয়ে পাওয়া আর পেয়ে পেয়ে চাওয়া।

কিন্তু জীবনটা সোজা রাস্তায় চলে না। চাওয়া আর পাওয়া বারবার একই জায়গায় ফিরে আসে না। আগের চাওয়া আর পরের চাওয়া হুবহু এক হয় না। লতিয়ে লতিয়ে উঠে, চাওয়া আর পাওয়া কেবল বেড়ে বেড়ে যায়।

বাঁচা বলতে মানুষের মতো বাঁচা। মানুষ দিয়েই আমরা চাওয়া-পাওয়া যাচাই করি।

কিন্তু মাপকাঠিটা কি বরাবর একই থাকে? মানুষ কি চিরদিন একই মানুষ থাকে?

পৃথিবীর সব কিছুর মতোই মানুষ-বস্তুটারও বদল হয়। প্রকৃতিকে বদল ক'রে মানুষ নিজেকেও বদলায়। তাই 'মানুষ' বলতে আমার মনে যে মানুষটা ভেসে থাকে, সেটা আমারই চেনা-জানা দেশকালের মানুষ। সে উলঙ্গ নয়, গুহায় থাকে না, প্রেম-ভালোবাসা বোঝে। তার সঙ্গে দেখা হ'লে সে মাথার টুপি সরিয়ে ঘাড়টা নুইয়ে দেয় না, হাত দুটো জোড় ক'রে নমস্কার করে। সে যখন ব্যথা পেয়ে কাঁদে, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে ষাট-ষাট করি। যখন কাউকে যন্ত্রণা দেয়, অনায়াসে বলতে পারি—'তুমি মানুষ নও'।

নানা দেশের নানা কালের নানা রকমের চাওয়া-পাওয়া দিয়ে আমি আলাদা আলাদা জগৎকে বুঝে পড়ে নিই। রক্তমাংসের মানুষটার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আমি একাধারে নিজেকে সহস্র ক'রে দেখি। আমার দেখাটা মানুষেরই দেখা হয়। মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে গিয়ে, গাছের সঙ্গে গাছ হ'য়ে গিয়ে আমি পৃথিবীকে দেখি না। নিজেকে মানুষ ছাড়া আর কিছু বানাতে পারি না। তাই মানুষের চোখেই গাছ-মাটি-জল-বাতাস সব কিছু দেখি। যখন বলি, গাছটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে—গাছ তা না বুঝলেও, মানুষ তা বোঝে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে হ'লেও নিজেকে একেবারে আমি মিশিয়ে দিতে পারি না। যেটা মেশাবো সেটা বজায় থাকা চাই। যার মধ্যে মেশাবো তার মধ্যে তাকে থাকতে হবে।

পুকুরে বৃষ্টির জল পড়লে তা পুকুরের জলে মিলিয়ে যায়। পুকুর টইটম্বুর হ'লে তখনই বুঝতে পারি পুকুরটা বৃষ্টির জলে বেড়ে উঠেছে।

আমি তেমনি ক'রে নিজেকে মেলাতে চাই—গাছ যেমন ক'রে অরণ্যের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেয়, আবার নিজের মধ্যে অরণ্যকে ধ'রে রাখে।

কবিতায় আমি কখনও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দিই না। নিজেকে একেবারে পর ক'রে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার নামটা আর কারও সঙ্গে মিললেও আমারই থাকে; আমি আমার চটিটা ফট্‌ফট্‌ করতে করতে, চশমাটা মুছতে মুছতে, চেনা লোকদের 'কী-খবর' বলতে বলতে মিছিলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই। মিছিলের ঠিক যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকি, সেখানে আমি একক। ঠিক একই জায়গায় দুজনের ঠাঁই হয় না। সকলের সঙ্গে থেকেও এক জায়গায় আমি নির্জন, আমি নিঃসঙ্গ।

আমি যখন আখ খাই, দাঁত দিয়ে আখের ছিবড়েটা ফেলে দিয়ে শুধু রসটুকুই খাই। কাউকে আখ খেতে বললে সে যদি আখটাকে ছেঁচে নিয়ে আখের রস বার ক'রে বাটিতে চুমুক দিয়ে খায়—তাহ'লে সেটা আখ খাওয়া হয় না। আখের রস খাওয়া হয়। আখের

রস আর আখ খাওয়ার রস—দুটোই রস বটে, কিন্তু দুরকমের রস।

কবিতার ভেতর দিয়ে কবি পাঠককে বলেন আস্ত আখটা তুলে নিতে। আখটা ছাড়িয়ে নিতে হয়। ছিবড়ে থেকে আলাদা ক'রে রসটা বার করতে হয়। কিন্তু পাঠক তাতে দাঁত লাগাবেন, না নোড়া দিয়ে ছেঁচে নেবেন—তারই ওপর নির্ভর করবে সেটা শুধু আখের রসই হবে, না তাতে আখ খাওয়ার রসও থাকবে। কবিতার ভেতরে রস থাকে, কায়দা ক'রে সে-রস বার করতে হয়।

তাঁতীর মনের চাওয়াটা কাপড়ের মধ্যে পেতে হয়। তবেই কাপড় পাওয়া যায়।

কিন্তু পাওয়াতে শেষ হ'লে চলে না।

তাঁতী নিজের জন্যে কাপড় বানাচ্ছে না। তাই তখন তার কাপড়-পাওয়াকে কাপড় চাওয়ার মধ্যে ফেলতে হয়। কেউ যেন সে কাপড় চায়। শুধু চাওয়ার মধ্যে শেষ হ'লে চলে না। পাওয়া চাই। চাওয়া আর পাওয়াকে মেলাতে হয়। কিন্তু কাপড়টা ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তার মধ্যে সমানে চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কটা বিনুনি ক'রে জড়ানো থাকে।

কবির কাজ সটান বস্তুকে পাইয়ে দেওয়া নয়। বস্তুকে চাওয়ানো। অভাব জাগানো। ব্যথায় কাতর ক'রে তোলা। কবিতায় আসল বস্তুকে ধ'রে দেওয়া যায় না। চোখে কানে কথা ব'লে শুধু একটা নকল তোলা হয়।

চাওয়াটা শুধু চাওয়াতেই শেষ থাকে না। পাইয়েও দিতে হয়। চোখে কানে কথা ব'লে বস্তুটাকে মনের মধ্যে পাইয়ে দিতে হয়। কবিতার কাজই হলো ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা।

কবিতার কারবারও এই বস্তুর জগৎটাকে নিয়েই। বস্তুকে মনের মধ্যে নিলে 'বস্তু' হয় 'বাসনা'। বস্তুর জগৎ থেকে বাসনার জগতে, বাসনার জগৎ থেকে বস্তুর জগতে—কবিকে বারেবারে চক্রাকারে ফেরাফেরি করতে হয়। কবিতা মনের মধ্যে উঠে বলে 'চলো চলো'। বাসনা থেকে বস্তুতে। বস্তু থেকে বাসনায়।

কবিতার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গেই বোঝাপড়া। বাসনার ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে বদ্‌লে বদ্‌লে নতুন করা।

যা আর পাঁচজনকে করতে হয়, বিচিত্র রকমের কাজ আর কাজের কাজ—কবি তার চেয়ে কমবেশি কিছু করে না।

কবিতায় থাকে ছন্দ। ছন্দ বলতে একটাই মানে নয়। ছন্দ মানে বাঁধা, এক জায়গায় করা, ফুটিয়ে তোলা। ছন্দ মানে আনন্দ, নেচে নেচে ওঠা, নেড়ে নেড়ে দেওয়া। ছন্দ মানে উদ্দেশ্য, ভাব, বস্তু।

সবটা মেলালে কী হয়?

কবিতায় থাকে উদ্দেশ্য। কিছু চাওয়া। বস্তুরই বাসনা। তারপর তাকে একটা আদি-অন্তে বেঁধে, বইয়ে দিতে হয়। এমন ক'রে বওয়াতে হয় আগাগোড়া যেন টানের মধ্যে থাকে। শুধু বাসনা থাকলে হবে না, তাকে বজায় রেখে কথার জালে একটানা বুনে যেতে হবে। বাসনার বুনুনিটাই হলো ছন্দ। ছন্দই ছক। ছন্দই গতি।

কবিতার চালই হলো ছন্দ। ছন্দ শুধু পদ্যে নেই, শুধু গদ্যেও নেই। পদ্য আর গদ্যে শুধু চালের তফাৎ। কবিতাকে ছন্দে ফেলতে হয়, ছকে বাঁধতে হয়। নি-ছক হ'লে চলে না।

কবিতার যা 'বস্তু', সেই 'বাসনা'র মধ্যেই ছন্দ থাকে। বাসনার ভেতর থেকেই ছন্দ তুলে আনতে হয়। সচিত্র সশব্দ বাসনা ছন্দে বাঁধা প'ড়ে কবিতা হয়।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে বোঝাপড়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বোঝাপড়া—চাওয়া-পাওয়ার সেই সম্পর্কটাই কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়।

এর বাইরে কবির সঙ্গে পাঠকের অন্য কোন রকমের বোঝাপড়া থাকতে পারে না।

এই সম্পর্কটা কবিতায় বজায় থাকলেও পাঠক যেখানে অবুঝ হন, কবিকেও সেখানে 'বুঝি না' বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

কবি হাল ছাড়েন না। পাঠকের মত 'বুঝি না' ব'লে লেখকও শুধু চোখ টেপেন।

লেখকের মত পাঠককেও যেন শেষকালে ঠেলতে না হয়!

আসলে কবিতাকে দু'চোখ চেয়ে চলতে হয়। একটি চোখ কবির। একটি চোখ পাঠকের। কবিকেও যেমন নিছক কবি হ'য়ে এক চোখে দেখলে চলে না। পাঠককেও তেমনি নিছক পাঠক হিসেবে একচোখো হ'য়ে থাকা চলে না।

কবি আর পাঠকের চোখোচোখি হওয়ার মধ্যেই থাকে কবিতার বোঝাপড়া।

ছন্দিত বাসনাকে বোঝবার এই পথটা সরল নয়, ঘোরালো। যাঁরা এই ছকটা মানতে রাজী নন, পৃথিবীতে বোঝাপড়ার কোন রাস্তাই তাঁদের কাছে খোলা নয়। মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়া ছাড়া তাঁদের কোন গতি থাকে না।

নটি

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রাজ্য পরকরতলগত। রুক্ষ দেশ, নিরুত্তর প্রকৃতি।

তবু দিন চলে যায়। মহাসমারোহে ঋতু পরিবর্তন হয়। বসন্ত আনে বেদনা ও আকুলতা। পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও কেঁদফুল ফুটে ওঠে উত্তাপে। চঞ্চল বাতাস আনে মন-উদাস-করা মধ্যাহ্ন। চন্দ্রালোকে উৎসবময়ী রজনীতে বিরহী পাপিয়া ডেকে ডেকে রাত জাগে। বকুল ও অশোক ফুল মঞ্জরিত হয়ে আনে সৌরভ, আনে সৌন্দর্য। সব আছে, তবু যেন কিছু নেই, কেউ নেই।

মোতির মনের ব্যথা বসন্তের মনে নেই। তার বরণে হোলির উৎসব হয়। আবীর খেলা হয়, গান, নাচ ও আনন্দ চলে। এই দিনে জানালায় পর্দা টেনে দিয়ে নিজের ঘরে বসে মোতি। প্রিয়তমের স্মরণে বিনা ফাগে হোলি খেলে তার মন—হোলি খেল মনা রে, বিন করতাল পখাওজ বাজে, অনহদকী ঝংকার রে। যখন মনে পড়ে এইরকম হোলির দিনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল খুদাবক্সের, তখন মনে হয় পাপিয়াও তার শত্রু। বারবার ডেকে তাকে তার দুঃখের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,

> পপইয়া প্যারে, কবকে বৈর চিতারো
> ম্যয় সুতীছী অপনে ভবনমে পিয় পিয় করত পুকারো॥

ঘোসের কাছে লেখা চিঠিখানা বারবার পড়ে মোতি। অপেক্ষা করতে লিখেছে খুদাবক্স, ধৈর্য রাখতে বলেছে। সে ত' জানে না মোতি কত দুর্বল! বারবার পড়ে পড়ে মলিন হয়েছিল চিঠিখানা। ভাগ্যে একপৃষ্ঠায় লেখা, তাই মোতি তাকে একটি রেশমের কাপড়ে জুড়ে, শাদা পাথরের বাক্সে কর্পূর দিয়ে রেখেছে।

মন উদাস হলে রানীমহালে গিয়ে গান শোনায় মোতি। শ্রোতারা উপলক্ষ্য মাত্র, গান গায় সে নিজের জন্য। গানে গানে মুক্তি পায় অনুধ্যানে।

বড় ঘনঘটা করে বর্ষা আসে গ্রীষ্মের তাপদাহনের পরে। দিগন্তের শেষ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উঠে আসে—আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘাশ্লিষ্ট আকাশ দেখে ভ্রম জাগে। মেঘলোকে পাগলা হাতীর দল যেন বপ্রক্রীড়া করতে বেরিয়েছে।

মেঘের গুরু গুরু সজ্জার দিনে মহলের অঙ্গনে একখানি নীল চিকণের সাড়ী পরে অযত্নে করবী সংবন্ধ করে তানপুরা নিয়ে বসে মোতি। শোনে, "আবনকী আওয়াজ। মহলান চঢ়ি চঢ়ি জোউঁ মোরী সজনী, কব আয়ে মহারাজ......উমগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিস বরষে, দামিনী ছোড়ী লাজ।"

তার মন এক প্রান্তর, সেখানে উন্মুখ মেঘ চারদিকে বর্ষণ করে ও দামিনী লজ্জা ত্যাগ করে।

গানে গানে কত কথাই যে বলে বিরহিণী—মত্ত বাদল এসেছে, কিন্তু প্রিয়ের সন্দেশ ত' আনলো না। কালো আঁধারে বিজলী চমকাচ্ছে, বিরহিন অতি ডর পায়োরে। ভয় করছে বিরহিণীর।

তারপর ঘনঘোরে বর্ষণ নামে। ছোট ছোট শ্যামল ঘাসের আস্তরণ পড়ে

সর্বত্র। প্রকৃতির চোখে লাগে শ্যাম অঞ্জন। পরিপূর্ণ দুর্যোগে শূন্য মন্দিরে বসে গান গায় মোতি। অস্থির বিদ্যুতের পত্রলিপি দেখে মন চঞ্চল হয়। বর্ষার নিশীথ একা যাপন করে মোতি—জগতে সকলেই নিদ্রামগ্ন শুধু আমি জেগে আছি...ম্যয়ঁ বিরহিন বৈঠি জাগুঁ। অন্য রঙ্গমহলের বিরহিণী হয় ত' মুক্তার মালা গাঁথে। কিন্তু মোতির অশ্রুই আজ মুক্তা। অন্তরের বেদনায় তার জন্ম। তাই সে আঁসুবনকী মালা গাঁথে।

শরতের প্রসন্ন দিনে, বুন্দেলা মেয়েরা ডালি মাথায় পদ্মফুল ফেরি করে পথে পথে, মন্দিরে মন্দিরে শরতের মাঙ্গলিক পূজার আয়োজন হয়। তাদের আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করে মোতি।

জল বিনা কমল, চন্দ্র বিনা রজনী, তেমনি প্রিয়তম বিহনে দুখিয়ারি মোতি। আকুল ও ব্যাকুল হয়ে সে রাত্রিদিন যাপন করছে—বিরহ কলেজো খায়—তুম বিন রহো ন জায়॥

কখনো আসে অভিমান। কেন এমন করে লগ্ন বিচার ক'রে খুদাবক্স? লগ্ন দিয়ে কি হবে? প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে সে যদি শেষ হয়ে গেল, তবে আর কি করবে খুদাবক্স। তোমার কথা স্বীকার করেছি, প্রতীক্ষা করে বসে আছি,—তুমি যদি বা বন্ধন ত্যাগ কর আমি ত' পারব না—

জো তুম তোড়ো পিয়া ম্যয়ঁ নহিঁ তোড়ুঁ।
তোরী প্রীত তোড়ি কিণ সংগ জোড়ুঁ॥
তুম ভয়ে তরুবর ম্যয়ঁ ভঈ পঁখিয়া।
তুম ভয়ে সরবর ম্যয়ঁ তেরী মছিঁয়া॥
তুম ভয়ে মোতি প্রভু হম ভয়ে ধাগা।
তুম ভয়ে সুনা হম ভয়ে সুহাগা॥

তারপরে কি কোন কথা থাকে? হয়'ত থাকে। ইতিমধ্যে আরো চিঠি এসেছে ঘোসের নামে। সবই'ত তাকে লেখা। এত প্রতীক্ষা, এত ধৈর্য আর প্রেমের কথা জানে খুদাবক্স। এত সহ্য করতে পারে সে।

তুমি যদি পারো ত' আমিও পারি খুদাবক্স। সেই চেষ্টা করতে যদি নয়ন বিশ্বাস হারিয়ে অশ্রুবর্ষণ করে, হৃদয় উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়তে চায়, তাহ'লে বল আমি কি করি?

তবু প্রতীক্ষা করে মোতি। পৃথিবীতে আসে রিক্ততার ঋতু বৈরাগী শীত। রুক্ষকেশ, সাধারণ বেশ, একখানি মোটা চাদরে শীত নিবারণ করে মোতি। তানপুরা হাতে মহলের পথ ধ'রে চলে। দেখে পথচারীর দৃষ্টিতে সংবেদনা ও শ্রদ্ধা জাগে মোতির ওপর।

শীতের মলিন সন্ধ্যায় মোটা তুলোর চাদর জড়িয়ে এসে বসে মোতি রাজ-অন্তঃপুরে। রানী সোৎসুক আগ্রহে বসে থাকেন। মোতি সেদিন গান করছিল—দরশ বিনা দুখন লাগে নৈনা। তোমার দর্শন বিনা নয়ন আমার ব্যথিত—। গানের সময়ে চেয়ে ছিলেন রানী পরে বললেন—মোতি, কার জন্যে তুমি গান গাও? শুধু আমার জন্যে ত' নয়!

এই প্রশ্নেই যেন খুব প্রশংসা হ'ল, এমনি ভাবে মোতি স্মিত হেসে অভিবাদন জানাল। তারপর বলল,—ঔর গানাকে লিয়ে।

এইটুকু কথাতেই সব বলা হয়ে গেল। আপনার জন্যে ত' নিশ্চয়ই—এই কথা উহ্য রেখে মোতি বলল, আর গানের জন্য। শ্রোত্রী শুনলেন। তারপর সেই প্রসঙ্গে কথা না বলে বললেন,—মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে তোমাকে কিছু দিই, আমার যে ভালো লেগেছে তার নিশানা হিসেবে। কিন্তু তোমার ত' অলঙ্কার বা বস্ত্রে আসক্তি নেই মোতি—তবে কি দেব?

বয়ঃকনিষ্ঠা তবু শ্রদ্ধেয়া এই রমণীকে পুনর্বার অভিবাদন জানাল মোতি। বলল, সরকার, এইরকম মাঝে মাঝে স্মরণ রাখবেন, আর দূরে সরিয়ে দেবেন না। এই দরজা যেন আমার কপালে বন্ধ হয়ে না যায়।

মোতির তাঞ্জাম চলে গেলে ঈষৎ শীত বোধ হলেও শালখানা এমনই হাতের উপর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন রানী। চোখের গম্ভীর দৃষ্টি ছুঁয়ে রইল দিগন্ত। নির্মল তরুণ ললাটে কয়টি রেখার আভাস প্রতিভাত হল। সহরে অনেক কিছু ঘটে চলেছে যার প্রতিকার বারবার চেয়েও তিনি পাননি। তাতে শঙ্কা এবং ক্রোধ হয়েছে মনে। কাশী যেতে চেয়েছিলেন, তার অনুমতিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নানা কারণে অশান্ত হয়েছে তাঁর মন। শেষ পর্যন্ত অসম্মান নিয়ে বাঁচতে হবে কি না, এই হয়েছে আশঙ্কা। মনের ভেতরে সেই অশান্তি পর্দায় পর্দায় বাড়ছে। পূজা ও জপে আশ্রয় মিলছে না, সঙ্গীতে আসছে না শান্তি।

আজ প্রভাতের কথা স্মরণ হল। ইংরেজের ফৌজ শহর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল। তাঁর শিবিকা অপেক্ষমান জেনেও তারা এতটুকু সরে গিয়ে পথ দিল না। অতি সামান্য ঘটনা। হয় ত' ঔদ্ধত্য নয়, হয়তো ফৌজী কানুন। তবু এরই মধ্যে এমনি ঘটনা যতগুলো ঘটেছে, সেগুলোকে মিলিয়ে দেখলে শঙ্কাই জাগবে। যেন কোন একটা ছবির প্রাথমিক রেখামাত্র ফুটে উঠেছে। একপাশে রঙ-ও পড়েছে। ছবিখানা কল্পনা ক'রে মনে আশঙ্কা জাগছে।

চোদ্দ

নতুন খবরের দূত আসে দশ দিক থেকে। শাহীসড়ক ধরে যে ক্লান্ত ফৌজের অক্লান্ত মিছিল চলে, তারা মুঠো মুঠো খবর ছড়িয়ে যায়। উৎকর্ণ হয়ে শোনে চুণারকি রিসালা হল্‌ট।

রাতের পর রাত হল্‌টের ওপর কোঠায় লণ্ঠন জ্বলে। বসে কথা কয় কত রকমের মানুষ। কত রকমের বেশভূষা তাদের। পরন্তপ ও খুদাবক্স শোনে। খবর পাওয়া যাবে ফৌজী ছাউনীতে। ছাউনীতে যাওয়া আসা নিয়ে সাহেবরা বড় কড়াকড়ি করছে।

খুদাবক্সকে চেনে সবাই। বিন্দুকীর রিসালা-মেজর সাহেবকে ভেট লাগিয়ে খুদাবক্স তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। রঘুবর সিংয়ের চোখে একটা ছায়া নেমেছে। খুদাবক্সকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

—কেন এই কাজ নিয়েছ?

—কিছু ত' করতেই হবে মেজর সাহেব—

—ছাউনী থেকে ছাউনী, খুব খবর পাও, না?

—কি খবর পাব বলুন?

তখন নিরীখ ক'রে দেখে রঘুবর হাসেন। বলেন,—বড় হুঁশিয়ার মানুষ তুমি খাঁ সাহেব। খুব খেয়াল রেখে কথা বল।

খুদাবক্স হাসে। বলে,—কিছু ডাক আছে কি?

—রিসালাতে খোঁজ নিয়ে যাও খাঁ সাহেব।

রিসালাতে অনেক কথা হয়। খুদাবক্সকে এগিয়ে দিতে দিতে চম্মন ও জোন খাঁ নীচু গলায় জানায়,—হ্যাঁ, জানিয়ে দিতে পারো চৌথা রিসালায় যে আমাদের এখানে নিশানার খবর

পেঁছে গিয়েছে।

—কি নিশানা?

—চাপাটি আর লাল কমল।

—এমনি চাপাটি?

হ্যাঁ। এই নিশানার সঙ্গে কিষাণরা খুব পরিচিত। পঙ্গপাল বা ফসলের মৌতের সময়ে কিষাণরা এই নিশানা ছড়িয়ে দিয়ে জানায় যে কোন দুর্যোগ আসছে।

খবর নিয়ে খুদাবক্স ফিরতে ফিরতে গাছতলায় বিশ্রাম করে। তার সহিসরা চাপাটি সেঁকে। দেখতে দেখতে কি যে বিস্ময় মানে খুদাবক্সের মন! একখানা রুটি, যা ঘরে ঘরে কত মানুষের জন্য নিত্য তৈরী হচ্ছে, তাই নাকি নিশানা! কার নিশানা? কে এর মধ্যে আছে? সবচেয়ে ব্যস্ততা ফৌজী ছাউনীতেই বা কেন?

চৌথা রিসালায় ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খায় একটা। সাহেবের কড়াহুকুমে তল্লাস না ক'রে কাউকে ছাড়ছে না শান্ত্রী। খুদাবক্সকে দেখে ছোকরা কমাণ্ড্যাণ্ট মেলেন্‌সবি এগিয়ে আসে। তার ফরমায়েস ছিল একটা বাদামী আরবী ঘোড়ার। শান্ত্রীকে হাত নেড়ে সে হুকুম জানায়, ঢুকতে গিয়ে খুদাবক্স শান্ত্রীর পকেটে টুপ্‌ করে একটা টাকা ফেলে দেয়।

ঘোড়াও পছন্দ করবার মতই। বাদামী রঙের কোমল লোমে ঢাকা চিকণ গা, ছোট ছোট খাড়া কান, খুরের ওপরে শাদা দাগ, চারটে পায়েই। মেলেন্‌সবি তারিফ না করে পারে না খুদাবক্সকে। বলে,—কিছু শিখিয়েছ কি?

—হ্যাঁ সাহেব, ট্রেন্‌ড ঘোড়া।

—কে ট্রেনিং দিয়েছে?

—আমি।

—ক্যায়সা তালিম দিয়া?

—যাতে আপনি খুশী হবেন।

—তুমিও ট্রেন্‌ড লোক মনে হচ্ছে।

—আপনার মেহেরবানিতে।

—দাম কত চাইছ?

—পঁচিশ।

দাম শুনে একটা শীষ্‌ দেয় মেলেন্‌সবি। ডাকে রিসালা মেজরকে। নহল সিং সন্তাল ধীর পদক্ষেপে আসেন। বড় গোঁফ দাড়ির প্রান্ত সুকৌশলে মুচ্‌ড়ে কানের পাশে তুলে দিয়ে বড় কায়দায় পাষাণ দিয়ে মুরেঠা বাঁধেন মেজর সাহেব। যোধপুরীর ওপরের ফৌজী কুর্তার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ঘোড়াকে দেখেন। তারপর বলেন, ঠিক আছে, বেশী চায়নি।

মেলেন্‌সবি আশ্বস্ত হয়। ভারতে আসবার আগে তাকে তার বাবা, এবং আসবার পর বুড়ো ডাক্তার ফরেষ্টার তাকে বারবার তালিম দিয়েছে। নেটিভরা সুযোগ পেলেই তাকে ঠকাবে। নহল সিং-এর আশ্বাস পেয়ে সে হাল্কা পায়ে চলে যায়।

চোখে চোখে তাকিয়ে রিসালা মেজর বলেন, খাবার সময়ে ডাক নিয়ে যাবে আমার ঘর থেকে।

মেলেন্‌সবি টাকা গুণে গুণে দেয় খুদাবক্সকে। টাকা পকেটে রেখে খুদাবক্স ঘোড়ার পাশে দাঁড়ায়। লাগামটা বাতাসে আস্ফালন করে হুকুম করে—সেলাম লাগাও! খেলওয়ালার

ঘোড়ার মত ভঙ্গীতে ঘোড়ী সামনের পা দুখানা উঠিয়ে সেলাম জানায়। বড় খুসী হয় মেলেন্‌সবি।

রিসালা মেজর সাহেব খুদাবক্সকে ডেকে বসতে বলেন চৌকিতে। খুদাবক্স বসে। নহল সিং তাকে একখানা চিঠি দেন। বলেন, ফয়জাবাদ থেকে কুচ্‌ আসছে, তাদের তুমি পাবে চার গম্বুজ মসজিদ ছাড়িয়ে। সেখানে রিসালদার সাহেব স্বরূপ সিংকে এই চিঠি দেবে। এ-ও খেয়াল রাখবে কি যে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

—আমাকে আপনি বিশ্বাস করছেন?

—বিশ্বাস করবার ভরসা পেয়েছি পরন্তপ চৌহান আর বিন্দ্‌কীর রঘুবরের কাছে। বিশ্বাস ভাঙলে তুমিই খতম্‌ হয়ে যাবে। আর খত্‌ খুব সোজা—তাতে গোলমালের কিছু নেই। যা বুঝবার তা স্বরূপ সিং বুঝবে। তুমিও শোন : প্রাথমিক শিষ্টাচার অন্তে—স্বরূপ ভাই, যে মেলা বসাবার কথা ছিল, তার কিছু কিছু ঠিক হয়ে গেছে। পুরা বন্দোবস্ত হবার পরে তারিখ জানলে যাবে। তার আগে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তৈরী হতে পার। খবর নেওয়া-দেওয়ার মুস্কিল। তবু বলছি চারটে হাতী, দুশো ঘোড়া আর পাঁচশো ভেড়া আমরাই যোগাড় করব। তুমি কিছু হাতী যোগাড় করবার ব্যবস্থা করো।

—মেলা খুব জমবে বলে মনে হচ্ছে।

—আশা করছি।

—তবে আমি চলি।

—তোমার কারবার হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। তবে একটা কথা—

—কি?

—বিন্দ্‌কীত রঘুবরজী খুব ছবি আঁকছেন।

—কি রকম?

—দেখাচ্ছি। বলে, লালচে তুলোট কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে একটা ছবি আঁকে খুদাবক্স। একটা গোল চক্র, তার মাঝখানে একটা ডাঁটার ওপর আধফোটা পদ্মফুল, চক্রটার পাশে ঊর্দুতে লেখে 'চাপাটি', নিরীখ করে দেখেন নহল সিং। কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনকে দেখেন। তারপর খুদাবক্স বলে—রিসালা মেজর সাহেবের এ খেয়াল এমন কিছু চমৎকার নয়, এ ছবি রাখলে তাঁর বদনাম। কি বলেন?

ছিঁড়ে ফেলে কাগজখানা খুদাবক্স। কুচিগুলো মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে ঠুকে ঠুকে বসিয়ে দেয়। নহল সিং তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। বলেন—তোমার সঙ্গে আমি একমত। তবে ফুলটা সাদা না লাল? কি এঁকেছিলেন রঘুবরজী?

—খেয়াল হয় লাল কমল।

দু'জনে দু'জনের চোখে চোখে দেখেন। খুদাবক্স ও নহল সিং নীরবে বিদায় জানান। নহল সিং বলেন, আমি গেটপাশ দিয়ে দিচ্ছি তুমি চলে যাও। সামনে এখন কমাণ্ড্যাণ্ট সাহেব থাকবে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে।

—জবাব দেওয়া যাবে।

—আচ্ছা।

বেরিয়ে আসতে আসতে খুদাবক্স কমাণ্ড্যাণ্ট সাহেবকে সেলাম জানায়। সাহেব

বলেন—তুমি মেলেন্‌সাবিকে ঘোড়ী দিয়েছ?

—হ্যাঁ সাহেব।

—আমাকে একটি এনে দিতে পারবে?

—খুব চেষ্টা করব।

—হ্যাঁ, চেষ্টা ক'রো। আমার পছন্দ হয়েছে।

রুটি আর কমলের নিশানা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। ফৌজ থেকে ফৌজ, ছাউনী থেকে ছাউনী। একখানা হাতে গড়া চাপাটি এনে ছাউনীতে পৌঁছে দেয় কোন অজানা বাহক। চাপাটিখানা হাতে হাতে ফেরে। সাহেব অবাক হয়ে জানতে চান—কি ক'রে এই চাপাটি এল? কি হবে এ দিয়ে?

সসম্ভ্রম জবাব আসে—জানি না হুজুর। কেউ পৌঁছে দিয়েছে।

সাহেবের তাড়নাতে শশব্যস্ত হয়ে প্রহরী শান্ত্রীরা বাহককে খোঁজে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। সাহেব ঘরে এসে রিপোর্ট লেখেন—নেটিভরা কোনো তামাশার কারণে চাপাটি বিলি করছে মনে হয়। এ-ও শুনেছি, যে রঙের কারবারে মন্দা পড়লে রং-রেজরীরা এই সঙ্কেত চালু ক'রে সকলকে জানিয়ে দেয়। যাই হোক, চাপাটির ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কোন মানেই হয় না। আমি বারবার দেখেছি চাপাটিগুলো একেবারেই মামুলী, কোন নতুনত্ব নেই।

এদিকে রাত জেগে চাপাটি গড়ে সেই ছাউনীরই ফৌজ ও রিসালা। সেই চাপাটি নিয়ে তারা পাঠিয়ে দেয় অন্য ছাউনীতে, পাশের গ্রামে।

কমল ও রুটির নিশানার কথা খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে। সময়ের প্রয়োজনে কত যে দ্রুত সৃষ্টি হয়েছে। গাঁয়ের দফাদার বা চৌকিদারের হাতে একখানা চাপাটি তুলে দেয় বাহক। চাপাটিখানা চার টুকরো ক'রে ভেঙে ফেলা হয়। তাতে বোঝা যায় সেই গ্রাম থেকে পুব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে এই রকম চাপাটির নিশানা চালু হয়ে যাবে। আশ্বস্ত হয়ে বাহক আরো কয়খানা চাপাটি নিয়ে চলে যায়। এই সঙ্কেত সরকারের ডাক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক দ্রুতগামী। অতি সহজে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে খবর।

প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে গ্রামীণ ভারতের মেলামেশার জায়গা হাটগুলো।

চোদ্দ লাখ মানুষের স্বপ্ন সফল ক'রে এগিয়ে আসে ব্যারাকপুরে কাওয়াজ ময়দানের এক সকাল—২৯শে মার্চ, ১৮৫৭।

সব খবর চেপে যায় সরকার। ব্যারাকপুরের খবর কলকাতায় পৌঁছয় না। ফোর্ট উইলিয়ামের দফতর থেকে খবরগুলোকে রংপোঁচ্ লাগিয়ে ভোল পালটে ছাড়া হয় বাজারে। হ্যাঁ, একটা পাগলা সিপাহী আর পাগলা জমাদার। কি ক্ষ্যাপামি করেছিল কে জানে! এমন কিছু ব্যাপার নয়।

বন্যার স্রোতের মত পাথর কেটে পথ তৈরী ক'রে নেয় আসল খবর। মঙ্গল পাণ্ডে আর ঈশ্বর পাণ্ডে ফাঁসীতে ঝুলে গিয়েছে ব্যারাকপুরে।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় ছটফট্ করে হিন্দুস্তান। একমাস...দেড়মাস...পিঙ্গল জটাজাল রুদ্রমূর্তি বৈশাখের খরতাপ উত্তর ভারতের বুকে ধুলো ওড়ায়। তারপরে তৃষ্ণাদীর্ণ আকাশে নামে রক্তসন্ধ্যা।

সহসা অশ্বারোহী ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে ঝাণ্ডা নাচিয়ে এক হুঙ্কারে জানিয়ে

যায় প্রতীক্ষমান জনতাকে, ১০ই মে মীরাট ক্যান্টনমেণ্ট। ফৌজ রুখে দাঁড়িয়েছে। বাঘী-সিপাহীর হাতে খুন হয়ে গিয়েছে ইংরেজ অফিসার। সেই ফৌজের দৃষ্টান্তে লড়াই সুরু করবার নিশানা মিলে গিয়েছে।

সুরু হয়ে যায় মহান এক সংগ্রাম।

পনরো

মোকাবিলা করবার এক মৌকা একদিন আসবে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু যখন সত্যিই এসে পড়ল তখন টালমাটাল হয়ে গেল সব। মীরাটের খবরের পরেই দিল্লীতে বাহাদুরশাহী কায়েম ক'রে সেদিকে চলেছিল ফৌজ। খুদাবক্স আর পরুতপও ভীড়ে পড়েছিল সেই মিছিলে। আতঙ্কিত ইংরাজ নরনারী শিশু দিল্লী ছেড়ে পালাচ্ছিল। তাদের হত্যা করাকে যুদ্ধ মনে করেনি খুদাবক্স। তাই পথে তাদের গাড়ী আটক ক'রে দেখেশুনে ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল। এক ছোকরা সাহেব রুখে উঠেছিল বন্দুক উঁচিয়ে। তার বন্দুকটা টেনে নিয়েছিল খুদাবক্স। বলেছিল, বন্দুক দেখিয়ে একজনকে খতম্ করেছ কি তোমাদের একজনেরও জান বাঁচবে না। খুব সাবধানে চলে যাবে। জবান্ সামলাতে চেষ্টা করবে। সবাই আমার মত ঠাণ্ডামাথা নাও হতে পারে।

আতঙ্কিত মহিলা যাত্রীরা মিনতি ক'রে সেই উদ্ধত যুবকের হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। পরুতপ বলেছিল, হিন্দুস্তানের মানুষ তোমাদের মতন নয়, মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে টানা-টানি করবে না। জানের মায়া থাকে হাঁটু ভেঙে বসে দয়া চাইতে চেষ্টা করো, বেঁচে যাবে।

হঠাৎ অবস্থা উল্টে গেছে। শাসিতই হয়েছে আজ শাসক। সাহেব এতবড় ঔদ্ধত্যের কথা মানতে পারেনি। ইতর গালাগালি দিয়েছিল পরুতপকে। তখন তার সামনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মুখের ওপর সহসা চাবুক মেরেছিল খুদাবক্স। ফর্সামুখ কেটে রক্ত পড়েছিল। তার মা তাকে টেনে নিয়েছিলেন ভেতরে। খুদাবক্স বলেছিল, যদি এই দিন কাবার করতে পারো সাহেব, আয়নায় মুখ দেখে খেয়াল করো কথা কি ভাবে বলতে হয়।

তারপরের কয়টা মাসের ইতিহাস নাগরদোলার ঘূর্ণীপাকে জড়ানো। দিল্লীতে মোগলশাহী কায়েম করে রাখবার কোন ইচ্ছে ছিল না ইংরেজের। প্রথম চোটের বিভ্রান্তিটা কাটতেই, ব্রিটিশ ফৌজ সংগীন তুলে মার্চ ক'রে এল। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইংরেজ ফৌজ গোটা সাতান্ন আটান্ন সালটার ওপরেই হিন্দুস্থানের মানুষের তাজা খুন ঝলকে ঝলকে ঢেলে দিল।

ঝাঁসীর খবরও কানে এল। যত ইংরেজ ছিল তাদের সব খুন ক'রে রানীর হাতে নগর ছেড়ে দিয়ে দিল্লীর দিকে আসছে ফৌজ। দুইদিনের মাথাতে তারা এসে পড়বে। সগর্বে একজন সিপাহী খুদাবক্সকে বলল—আসল বাদশাহী ফৌজের মত কাজ করেছে তারা। বাই-সাহেবের হাতে রাজপাট তুলে দিয়েছে। আর যত বেইমান ইংরেজ ছিল, তাদের সব খতম্ করেছে।

খবর শুনে প্রথমটা থতমত খেয়ে যায় খুদাবক্স। প্রশ্ন করে,—বিবি, বাচ্চা, বুড়া, সব?

—তাই ত' শুনেছি।

—তাহলে সত্যিই অন্যায় করেছে বল?

—এরই নাম লড়াই খাঁ সাহেব।

—লড়াইয়ের ঠিক বে-ঠিক কি অমনি আন্দাজ করা যায়?

—তুমি বলছ বটে কিন্তু আমার চুল সাদা হয়ে গেছে অংরেজের গোলামী ক'রে, তুমি জানো, বিনা কারণে, বিনা দোষে তারা কতবার হাসতে হাসতে গুলী চালিয়েছে, ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মেরেছে কত হিন্দুস্তানের মানুষ? আমি আপন আঁখ দিয়ে দেখেছি; দেখেছি আর ভেবেছি, খোদা আঁখ দিয়েছিল কি এইসব দেখবার জন্যে? আজকের দিনে জমানা বদলে গেছে, আর তাই বদলা নিতে নেমেছি আমরা সবাই। এখন অনেক পুরোনো আমলের ঠিক সব বে-ঠিক হয়ে যাবে, আর নতুন কথা বয়ান করব আমরা।

প্রতিবাদ করল না খুদাবক্স। প্রবীনের কথার মধ্যে কিছু সত্যি ছিল। বুড়ো আবার বলল,—তা বলে মনে ক'রো না বিবি আর বাচ্চাদের খুন করা ঠিক হয়েছে। আমি তা বলছি না। মনে হয় সিপাহীদের মাথার ঠিক ছিল না। লড়াই কি না?

দিল্লীর পরেই খবর মিলল কানপুরে খুব লড়াই হবে। কানপুরের নানা সাহেব আর তাঁতিয়ার দলে অনেক ফৌজ গিয়ে নাম লেখাচ্ছে।

ছাউনি থেকে ফৌজ দলে দলে আসছিল দিল্লীর দিকে। দিল্লী সহরে ইংরেজশাহী পুরো খতম হয়ে গিয়েছিল কতদিন ধরে। সেই সময়টা যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি করা যেত! চেষ্টা যে চলেনি তা নয়, কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটল খুব তাড়াতাড়ি। ঠিক তাল রাখা গেল না।

মাথার ওপর ইংরেজ নেই। বাহাদুর শাহ্ দিল্লীতে লাল কেল্লায় গদীতে বসেছেন। তিনিই এখন স্বাধীন হিন্দুস্তানের বাদশাহ্। এই খবর পেয়ে গ্রাম, সহর ও ছাউনী থেকে দলে দলে লোক এসে ভীড় জমাল দিল্লীতে। নতুন শাহীর কর্মচারীরা ঘোড়া চড়ে টগ্‌বগিয়ে মোগলশাহীর রাজধানীর পাথর বাঁধানো পথে পথে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলেন। মনের আনন্দে মুখে মুখে গান ফিরতে লাগল পথে-ঘাটে। সন্ধ্যার পর চাঁদনীচক কোতোয়ালী বা কেল্লার ময়দানে ফৌজ ও জনতার জমায়েতে গান জমে উঠল,

'দরিয়া মে' তুফান
বঢ়ি দূর ইংলিস্তান
জল্‌দি যাও জল্‌দি যাও
ফিরিঙ্গি বেইমান॥'

এসব গানে সুর ও কথার কারুকাজ নেই। সময়ের প্রয়োজনে ও প্রাণের তাগিদে এই সব গানের সৃষ্টি। প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলায় যাদু আছে এই গানে।

'হাণ্টার গোলী খুব চলায়া এক শও সাল পুরা
আর চুহাকে তরাহ্ ছুপ্‌ছুপ্ ভাগো পল্টনওয়ালা গোরা
যিস্তা পরেড্ দিল্ চাহে লাগাও লণ্ডন পে' মৈদান
হমারা মুলুক হামকো ছোড়ো ফিরিঙ্গী শয়তান॥'

সকাল থেকে রাত অবধি বিভিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের ফৌজ ইংরেজদের কখনো হত্যা করে, কখনো বা হাটিয়ে দিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসে। একদিন খবর পেল খুদাবক্স, ঝাঁসী থেকে ফৌজ আসছে। ঝাঁসীতে যত ইংরেজ ছিল সব খুন হয়ে গিয়েছে। সিপাহীরা রানীর হাতে শহর তুলে দিয়ে আসছে দিল্লীর দিকে।

লড়াইয়ের তুফানে পড়ে খুদাবক্স যতবারই চেষ্টা করল ঝাঁসীর পথে একবারও এগিয়ে যেতে পারল না। লক্ষ্ণৌ-এর প্রান্তে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর ফিল্‌ড্ সাহেব বলেছিল, —এ লোকটাকে দেখলেই ত' ফাঁসীর হুকুম দেওয়া যায়। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এর হাড়ে হাড়ে রয়েছে শয়তানী। কিন্তু ফতেপুরের পাঁচ নম্বর রিসালা এসে পড়াতে পালাতে হলো সব সাহেবদের। সাহেবরা জিতলে যে খুদাবক্সকে নির্ঘাত ফাঁসীতে ঝুলতে হতো তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। গাছে মজবুত ডাল আছে, বিলিতী কারখানার শক্ত দড়ি আছে, কিছু নেটিভ মিললেই ঝুলিয়ে দেওয়া চলে। গরুর গাড়ীর ওপর দাঁড় করিয়ে, ফাঁস পরিয়ে গাড়ীটা টেনে দেবার পর যখন জোয়ান দেহটা যন্ত্রণায় মোচড় খায় শূন্যে, তখন হাসতে হাসতে বলা চলে, এবার তোমার কোন বাহাদুর শাহ বাঁচাবে?

লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়ে কাণপুরের পথে প্রচুর ফৌজ মিলল। নানা সাহেবের কম্যাণ্ডার হয়েছে তাঁতিয়া। তার ফৌজের জমজমাট অতুলনীয়। গোয়ালিয়র থেকে বাছাইকরা ফৌজ এসেছে।

কাণপুরের পথে যারা জুটল তাদের মধ্যে ছিল চম্পনলাল। ছোটখাটো চেহারা, ছিপছিপে গড়ন, বয়স চল্লিশের কাছে। তার সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলল পরন্তপ। এদিককার পথ, ঘাট, ক্ষেত সব চম্পনলালের নখদর্পণে। পথপ্রদর্শক অতএব সে-ই হল।

ওদিকে বিবিঘরের খুনেজখমের প্রতিশোধ নিতে ইংরেজ আসছে, তাই সাবধান হয়ে চলবার প্রয়োজন ছিল। আড়াই শ' সিপাহী, চল্লিশজন রিসালা, সকলেই পুরোন পল্টনের লোক। বন্দুক ছিল দুইশ'র ওপরে।

কাণপুরের এগারো মাইল দূরে যখন হল্‌ট করেছে খুদাবক্সদের দল, তখন চম্পনলালকে পরন্তপ ডাকল। বলল,—আমি মনে করি তুমি একটু এগিয়ে যাও। দেখ খেয়াল করে সামনে দুশ্‌মনের ফৌজ মেলে কি না মেলে।

চম্পনলাল দুপুরের পর রওনা হয়ে গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তার চেহারা যখন মিলিয়ে গেল, তখন তার পিছু নিল পরন্তপ। রামনেহাল আর কিশোরী গাছের মাথায় উঠে দূরে দূরে নজর রাখছিল।

দুই ঘণ্টার মাথায় ফিরে এল চম্পনলাল। বলল,—সব ঠিক আছে। এখন যাওয়া চলে।

খুদাবক্স বলল,—দাঁড়াও পরন্তপকে আসতে দাও। তুমি এইখানে বস চম্পন, থকে গিয়েছ। এত পরেশান্ হয়ে পড়েছ চলবে কি করে?

—চলবে না! বলে আঁধার থেকে বেরিয়ে এল পরন্তপ। চম্পনলালের ঘাড়ে তার থাবার মত হাতখানা রাখল। বলল,—তোমাকে আমরা দশদিন ধরে নজরে রাখছি চম্পন। বড় চাল দিয়েছিলে। কিন্তু বাজীমাৎ করতে পারলে না। কত দিন থেকে ইংরেজের নিমক খেয়েছ হারামী? ষ্টেনিং ত' কাঁচা রয়ে গিয়েছে দেখছি। চম্পনলালের মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। পরন্তপের পায়ের ওপর পড়ে হাউ হাউ ক'রে সে কেঁদে উঠল। তাকে তুলে ধরল খুদাবক্স। পরন্তপের কাছ থেকে চিঠিখানা নিয়ে সকলকে শুনিয়ে পড়ল—

লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রফোর্ডের কাছে দাসানুদাস অর্জুন সিং ওরফে চম্পনলাল ওরফে গুলজারীর নিবেদন এই যে, এখানে দুই শ' তিপ্পান্নজন সিপাহী, নওগঞ্জ-এর চোদ্দ নম্বর রিসালার চল্লিশজন এবং দুই শ' তিন বন্দুক আছে। আর পেছনে যে পাঁচনম্বর বেঙ্গল ইন্‌ফ্যান্ট্রির ফৌজ আছে.....

চিঠি শেষ করল খুদাবক্স চরম নীরবতার মধ্যে। জমায়েতের মুখে যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা ফুটে উঠেছে তার দিকে চাইতে পারল না চম্পন। এবার কি হবে? এই প্রশ্ন যখন

চোখে চোখে খেলে গেল, ক'ণ্ঠগুলো একসঙ্গে ভীষণ দ'ড়াজ্ঞা উচ্চারণ করল—মোত!

চম্পনলাল কাঁদতে লাগল, ভয়ে ও আতঙ্কে তার গলা চিরে যেতে লাগল—ভাইসব, আমার বিবি আছে, বাচ্চা আছে,.....

—ঠিকানা মেলে ত' তাদেরও খতম ক'রে আসব। বেইমানের ঝাড় কমে যাবে দুনিয়া থেকে। নিশানা ঠিক করতে করতে বলল খুদাবক্স। গুলির আঘাতে চম্পন দোড়ে গেল দুই-পা। তারপর ভেঙেচুরে পড়ল মাটিতে। পিঠে আর একটা গুলী করল খুদাবক্স।

রামনেহাল নেমে এল। বলল—মাইল দুই পুব থেকে অংরেজের ফৌজ আসছে।

—তবে?

—তবে তৈরী হয়ে যাও। পশ্চিম দিকে চলতে থাক।

কিশোরী নেমে এল। বলল—পশ্চিম দিকে যাওয়া চলবে না। অংরেজ ফৌজ মার্চ ক'রে যাচ্ছে মনে হয়, মাইল চারেক দূরে। অন্য ফৌজও হতে পারে। তবে ওদিকে যাওয়া নিরাপদ কি?

একমাত্র পন্থা খোলা আছে, যুদ্ধ।

—ইংরেজ ফৌজ কত হবে?

—বোঝা যায় না। মনে হয় সবই রিসালা।

গাছপালার আড়ালে ছড়িয়ে পড়ল দলটা। আধঘণ্টা বাদেই ইংরেজ সৈন্যদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাছে এল। গর্জে উঠল বিপক্ষের বন্দুক। ঘনসন্নিবিষ্ট আমবাগানের গাছের ফাঁকে ফাঁকে গুলি তেমন চলল না। ইংরেজদের ঘোড়সওয়ার বড়জোর একশো কুড়িজন। বৃথা গুলী খরচ না করে তারা ঢুকে পড়ল সামনের ফাঁকা জায়গাটায়। বন্দুকে বন্দুকে আর চলে না। ঝলসে উঠল তরবারি।

দাঁতে ঠোঁট চিপে লড়তে লাগল খুদাবক্স। সাহেবের ঘোড়া যখন ভয়ে দুই পা তুলে সোয়ারীকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে, তখন পেছন থেকে গুলী বিঁধল তার ডান কাঁধে। ঘুরে পড়ে গেল খুদাবক্স। পেছন থেকে সওয়ার ও সিপাহীরা ঘিরে আসছে দেখে ইংরেজ সওয়াররা বুঝল বোকামি হয়েছে। বাগানের গাছপালার আড়ালে কতজন আছে বিশ্বাস কি? এই ভাবে ফাঁদের মধ্যে পড়াও মূর্খতা হবে। বেরিয়ে গেল তারা।

খুদাবক্সের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দশটা দিন কেটে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণার বোধ নিয়েই জাগল খুদাবক্স। বোধ হল একটা শিবমন্দিরে শুয়ে আছে সে। পরন্তপ তাকে তুলে ধরে বসাল। উদ্বেগে তার চেহারা হয়েছে পাগলের মত। চুলগুলো রুক্ষ, চোখ লাল। খুদাবক্সকে বসিয়ে দিয়ে সে বলল,—আমি ভাবিনি খুদাবক্স যে তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে পারব। দশদিন হুঁশ ছিল না তোমার।

খুদাবক্স ব্যথার জায়গাটায় হাত দিয়ে যন্ত্রণায় মুখখানা কুঁচকে চেষ্টা করে একটু হাসল। পরন্তপকে বলল, তোমার কি চেহারা হয়েছে পরন্তপ?

—আর তোমার সুরৎ দেখেছ? মোতি দেখলেও চিনতে পারবে না।

—কি বললে? খুদাবক্সের গলায় বিস্ময়। পরন্তপ বলল, আমি আর কি বললাম খুদাবক্স, দশদিন ধরে তুমি কি বলেছ তা' ত জান না।...মোতি কে খুদাবক্স?

এক মুহূর্তে কেমন যেন একটু বেদিশা হয়ে পড়ে খুদাবক্স। কি দেখে আর কি বললে, ঠিক বোঝা যায় না। একটু পরে ঢোক গিলে বলে, বলব পরন্তপ।

—এতদিন বলনি তাই জানতেও পারিনি। অথচ বেহোঁসীর মধ্যে তুমি শুধু তাকেই ডেকেছ।

—আমরা কোথায় রয়েছি পরন্তপ?

—নিরাপদ জায়গা। যমুনার ধারে একটা শিবমন্দিরে। এখানে আর দুইদিন থাকব। তারপর চলে যাব লাল্‌থাগড়। সেখানে একটা হল্‌ট আছে। সেখান থেকে আমরা চল্‌ব ঝাঁসী।

—ঝাঁসী কেন পরন্তপ?

—কেন না, আর সব জায়গায় লড়াই ভেঙে গেছে খুদাবক্স, সেখানে বড় জোশের সঙ্গে লড়াই জমে উঠেছে। কাণপুরে আর লড়াই হবে না। কাণপুর অংরেজের হাতে। কাল্পীতে চুরানগম্বুজে তাঁতিয়া মস্ত ছাউনী ফেলেছে কিন্তু সেখানে কেন যাব খুদাবক্স? লড়তে চেয়েছি আর লড়াই ভেঙে ভেঙে গেল সর্বত্র। তবে যেখানে লড়াই-এর ময়দান মিলবে সেখানেই যাব।

—ঝাঁসীর খবর আরো বল পরন্তপ।

—ঝাঁসীতে যে রকম লড়াই-এর ইন্তেজাম জমেছে সে রকম আর কোথাও হয়নি। আশপাশের চারশো মাইল জুড়ে লোক তৈরী হয়েছে লড়াই-এর জন্যে। বাইসাহেবের নাম পৌঁছে গেছে অংরেজ দফ্‌তরে। বিলেত থেকে কোন জবর সাহেব এসেছে বাইসাহেবের সঙ্গে লড়তে। আরো খবর, যে ঝাঁসীওয়ালীর ঝাণ্ডার তলায় যত মেয়ে, পুরুষ সবাই একসঙ্গে জুটেছে। আর কি খবর চাও খুদাবক্স?

পরন্তপের কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। সযত্নে গরমজল দিয়ে খুদাবক্সের ক্ষতস্থান পরিষ্কার ক'রে সে। মলম লাগায় ধীরে ধীরে। বলে, ভাগ্যে অজ্ঞান হয়ে ছিলে। ছোরা দিয়ে গুলীটা বের করেছিলাম। ঘোড়ার পিঠে ক'রে এখানে আনবার সময় মনে হয়নি আর তোমার গলা শুনতে পাব, কি তোমার সঙ্গে কথা কইব এমনি বসে বসে। যত রক্ত পড়েছে তত কি বোথার! কপাল পুড়ে গিয়েছে, শুধু জল খেয়েছ আর মোতিকে ডেকেছ।

মোতির কথা বলতে গিয়ে কথা খুঁজে পায় না খুদাবক্স। লজ্জা ও সঙ্কোচে বিব্রত হয়ে পড়ে। পরন্তপের চোখে কৌতূহল। সে এক নতুন খুদাবক্সকে দেখছে। লাগসই কথা খুঁজতে অনেক সময় লাগে খুদাবক্সের। বলে, সাতবছর আগে...

সশ্রদ্ধ মনোযোগে শোনে পরন্তপ। মাটির দিকে চেয়ে, লজ্জা ও আনন্দের সঙ্গে জীবনের প্রিয়তম প্রসঙ্গে কথা কইতে গিয়ে খুদাবক্সকে সলজ্জ কিশোরের মত দেখায়। লাজুক হেসে বলে,—সেই জন্যেই ত' ঝাঁসী ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলাম।

—কিন্তু সে অপেক্ষা ক'রে আছে তুমি জান?

—নিশ্চয়।

—কেমন ক'রে?

—সে তুমি বুঝবে না পরন্তপ।

—কি রকম দেখতে সে তা'ত বলনি।

—তাই'ত! বলে আবার কথা হারিয়ে যায় খুদাবক্সের।

পরন্তপ সস্নেহে বলে,—আমি আন্দাজ করেছি খুদাবক্স।

খুব আশ্বস্ত হয় খুদাবক্স। বলে,—সব কথা বলা যায় না পরন্তপ।

খুদাবক্সের কাঁধের ব্যথা আরাম হতে আরো দিন দশেক লাগে। লাল্‌খাগড়ের হল্‌টে বসে খুদাবক্সের কাঁধে জোর মালিশ ক'রে পরন্তপ। বলে, মনে জোর ক'রে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ খুদাবক্স।

দুধ জোগাড় ক'রে খুদাবক্সকে ধমক দিয়ে খাওয়ায় পরন্তপ। বলে, তাগদ্‌ বাড়িয়ে নাও। কোন হাতে বন্দুক ধরবে?

এই হাতে। আস্ফালন করে খুদাবক্স। পরন্তপ বলে, এবার তুমি আমার জাত মারলে খুদাবক্স। কিছু আর রাখলে না। খুদাবক্স বলে, তোমার জাত ছিল না কি পরন্তপ?

—ছিল না? বলে গোঁফে চাড়া দেয় পরন্তপ। বলে, চার বাঁশ চল্লিশ গজ, অঙ্গুলে অষ্ট প্রমাণ, মার মার মোটা তাওয়া মৎ চুকো রে চৌহান! আমি হলাম চৌহান—শ্রেষ্ঠ রাজপুত। এমন দিন ছিল, যে চৌহান পায়ের আঙুল দিয়ে সর্দারদের গদীতে বসবার সময়ে টিকা পরাত কপালে। জাত নেই তোমার! তুমি যেমন গোঁয়ার, তেমনি একরোখা! কখনো বলে, তুমি নিষ্ঠুরও আছ একটু। না নিজেকে দয়া কর, না পরকে।

—তোমাকে কি করেছি পরন্তপ?

—আবার কি করবে? জান খেয়ে দিয়েছ। না আখেরের কথা ভাব্‌লাম, না অন্য কিছু, তোমার সঙ্গে এখন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। একবার চল না তুমি ঝাঁসী!

—কি করবে?

—কয়েদ করিয়ে দেব। সাদী দিয়ে দেব। বড় তেজ হয়েছে তোমার, খুব টক্কর নিয়ে বেড়াচ্ছ।

—এই কি সাদীর সময় পরন্তপ?

—তুমি বড় উজ্‌বুক খুদাবক্স! আমি কি বলছি এই আজকেই? না, এই রকম বেহিসাবের দিনে?

বলে আর জোর জোর মালিশ লাগায় তার কাঁধে। বড় অধৈর্য হয়ে গেছে সে। বলে, বসে বসে আমার রক্ত রেগে গেছে। আর সহ্য হচ্ছে না।

খুদাবক্স বলে, উঠ বস করো, ছুটে বেড়াও!...

—তোমাকে দেখে দেখে মনে হয় তুমি ঘোড়া হলে ঠিক হত। এই রকম মোটাবুদ্ধি আর গোঁয়ার তেজ, ঘোড়া হলে দেখতেও ভালো হত। কি দেখে যে সেই মেয়ে ভুলেছে...

চোট লাগবার ঠিক একমাস বাদে রওনা হয় খুদাবক্স।

অরছারাজ্যের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে চেনা ভূ-প্রকৃতি দেখে বড় খুসী হয় দুজনেই। শীত শেষ হয়েছে, বসন্ত আসতে সামান্য বাকি। পথের পাশে ক্ষেত ভরে অড়হরের ফুল ফুটেছে, বুনো কুল পেকে ঝরে পড়েছে। এইখানে যেন এখনো জীবনটা নিরুপদ্রব রয়েছে। খুদাবক্স কুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ঘোড়াটাকে চুরি ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল খাইয়ে দেয়। পথে অনেক যাত্রী মিলে যায়। বাঘী সিপাহী ও রিসালা, যাদের আর কোথাও ঠাঁই হবে না ফাঁসীর দড়ি ছাড়া, বাইসাহেবের ফৌজে নাম লেখাবার জন্যে তারাও চলেছে। হত্যা, অত্যাচার, এবং লুঠেরাজের বিভীষিকা পেছনে ফেলে এসেছে তারা। খুদাবক্স, পরন্তপ ও তাদের চোখে একই কথা। জীবনপণ ক'রে লড়াইয়ে নেমেছিলো, সেই লড়াই ভেঙে-চুরে গেছে। আজ শেষ লড়াই-এর জন্যে চলেছে তারা। এই উপলক্ষিই যেন সখ্যতের রাখী। পরস্পরের সঙ্গে একটা দৃঢ় বন্ধন আজ অনুভব

করে সবাই। কেউ আহত, কারো ঘোড়া জখম, কারো পোষাক ছেঁড়া, কতজনের ঘরবাড়ী আত্মীয়-স্বজনের কোন ঠিকানা নেই, কেউ খবর পেয়েছে ফাঁসীতে ঝুলে গেছে তার বাপ ভাই। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ হতাশা বা দুঃখের কথা বলে না। খুব হাসিঠাট্টা চলে। মৃত্যুকেই ভয় ছিল। মৃত্যু কি তাও জানা হয়ে গেছে। আর কি রইল? রইল জীবন। তবে সেই জীবনটুকু হাসি দিয়ে ভরে দেব না কেন? যে যার অভিজ্ঞতার কথা বলে। এমনভাবে হাসে ধুলোভরা ভুরু কুঁচকে যেন পরম কৌতুকের ব্যাপার।

—ফাঁসিতে ঝুলে গিয়েছিলাম, বিষ্ণু সিংয়ের দল এসে দাঁড় খুলে দিল। গলাটা জখম হয়ে গেছে।

—গ্রামটা জ্বালিয়ে দিল, সে আগুন দূর থেকে দেখছি, তখনো জানি না, সেই আগুনে পুড়ে মরে গেল আমার বোন আর কচি ভাইটা।

—সাহেবকে খতম করলাম, তখন তার খিদ্‌মৎগার, আমারই জাত ভাই, আমার ডান-চোখে চালিয়ে দিল ছুরি।

—আর আমার বাঁ হাতখানাই উড়ে গেল। বলে বন্ধ সিপাহী, বাঁ দিকের ফাঁকা আস্তিনটা নাচিয়ে হাসে।

পরন্তপ লঘু করে এই পরিবেশ। বেসুরো গলায় গান ক'রে, আজেবাজে গল্প ক'রে আর খুদাবক্সকে সাবধান ক'রে ক'রে চলে। সকলকে বলে, এই শালাকে বে-জখম আস্ত নিয়ে যেতে হবে। ফরমায়েসী মাল। তবে বড় বেয়াড়া মানুষ। ভাইসব, তোমরা এর কোন বে-চাল দেখলেই পিটে দিও, আমি হুকুম দিচ্ছি।

খুদাবক্সকে দেখে তারিফ্‌ করে সবাই। হাতকাটা বুড়ো বলে, খুব খাশা মাল। কার ফরমায়েস?

পরন্তপ বলে, নাম জানালে মেরে ফেলে দেবে, গাঁওয়ার পাঠান'ত?

ধীরে ধীরে কাছে আসে বড়োয়াসাগর। আস্তে আস্তে দৃশ্যপটে আসে লুঠেরাজের ছাপ। খাদ্য সংগ্রহ করতে মুস্কিল হয়। এক এক জায়গায় থেমে গ্রামবাসীদের মারফতে কত কথাই যে জানা যায়! খাদ্য ও সাহায্যের বদলে টাকা দেয় খুদাবক্সরা। সহজেই কৃতজ্ঞ ও আকৃষ্ট হয় গ্রামবাসীরা। মৌকা বুঝে কিছু পুরোনো পাওয়ার সর্দার আবার লুঠেরাজ কায়েম করেছে। সানুনয়ে তারা অনুরোধ করে দুই একদিন থেকে যেতে। দুই একদিনের মধ্যেই ঝাঁসী থেকে কিছু ফৌজ এসে পড়বে বলে তারা বিশ্বাস করে। পরন্তপ খুদাবক্সকে বলে, বড়োয়াসাগরের কাছে এসে পড়েছি মনে হয়। থেকে গেলেও পারি দিন দুই। চাই কি কিছু পুরোনো দোস্ত্‌ মিলতে পারে। কি খুদাবক্স, মনে পড়ে দশ বছর আগেকার কথা?

—হাঁ চৌহান সাহেব, খুব মনে পড়ে, গর্জন সিংহের সঙ্গে দেখা হয় যদি বদ্‌লাটা নিয়ে নিই।

—বদ্‌লা ছাড়া কোন কথা মনে পড়ে না তোমার?

পরন্তপ একটা স্যোর আওড়ায়। তারপর বলে, পুরোনো দোস্ত, তার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করবে, একটু ফূর্তি করবে—তা নয়, শুধু খুন, জখম! ছো ছো, তোমার মত দোস্তের জন্যে আমার জীবনটাও গেল নষ্ট হয়ে।

—তবে যাও না ছেড়ে। নয় তো, আমিই যাচ্ছি।

পরন্তপ বলে,—আরে পাঠান, তোমাকে আমি একলা ছাড়ব না কি? আমি আগে

পৌঁছব, ভেট করব সেই যাদুগরীকে যার জন্যে নাকি পাঁচবছর ধরে ঝুরে ঝুরে তোমার মত একটা উজ্‌বুক দিন কাটাচ্ছে। নিশ্চয় সেও এক বাঘ্‌নী, তোমার আর নইলে মনে ধরেছে?

খুদাবক্স হেসে ফেলে। বলে,—অন্য লোকের কথা তুলে ঝগড়া করছ কেন?

সাব্যস্ত হয় সেখানেই তারা থাকবে। সহযাত্রীদেরও বোঝায় পরন্তপ। বলে, আমরা ত' বাইসাহেবেরই লোক, তাঁরই রাজস্ব লুঠপাঠ হতে দেওয়া অন্যায় হবে। একদিন থেকে যাই, কি বল?

গ্রামের কাছারীতে থাকবার বন্দোবস্ত হয় তাদের। এখনো তেমন গরম পড়েনি। গ্রামের একান্তে বড়োয়া নদীর একটি ছোট্ট শাখা। সেখানে স্নান ক'রে শ্রান্ত সৈনিকরা। খোলা আঙিনায় আগুন জেব্বলে রান্নার উদ্যোগ করে। তহশীলদারের তৎপরতায় কিছু ভাল চাল আর ঘি মিলেছে, একটা খাসীও পেঁাছে দিয়েছে সে। দীর্ঘদিন বাদে রান্নার প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুজব চলেছে। গাঁয়ের কয়জনকেও ডেকেছে পরন্তপ।

স্নান করতে গিয়ে খুদাবক্স স্বল্প জলের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখে। গ্রাম থেকে ছোট ছেলের কান্না শোনা যায়। কোন ছোট মেয়ের গলায়—'ভাই! ভাই!' ডাক কানে আসে। চোখে না দেখেও খুদাবক্স মনে করতে পারে মেয়েটার পরনে ধূলি-মলিন লাল খস্‌খসে কাপড়ের ছাপা ঘাঘরা, গায়ে গাঁয়ের দর্জি'র বানানো সেই কাপড়েরই আঙিয়া। পায়ে তার মল থাকলেও থাকতে পারে, তবে কানে যে রূপোর লবঙ্গ গোঁজা আছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই।

গ্রামের শান্ত পরিবেশ তাকে মুগ্ধ করে। ধূলো, বন্দুকের গর্জন, কামানের ধোঁয়া, আহত মানুষের আর্তনাদ, ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং রক্তের গন্ধ এইসব ছাড়া তার কিছু মনে পড়ে না। তারই পরে এই শান্ত পরিবেশ, নদীর ওপরে তারার ছায়া, বাতাসে ফুলের গন্ধ, তার মনে এনে দেয় বিরাম।

একদিন সে কথা দিয়েছিল সময় হলে ফিরবে। আজ সেই সময় হয়েছে।

বড়োয়াসাগর থেকে ঝাঁসী। কতদিন পরে ফিরছে খুদাবক্স? হিসেব থাক, ফিরছে যে এটাই বড় কথা। মাঝখানের বছরগুলোকে গুণে কি হবে? আসলে সময় এসেছে বলেই তাগিদ এসেছে তার মনে।

স্নান সমাপনে যখন ফেরে খুদাবক্স, তাকে দেখে পরন্তপ মুখে চুক্‌চুক্‌ ক'রে শব্দ করে। বলে, বড় আফ্‌শোষ, এত এত দেশ ঘুরিয়ে আনলাম ঘোড়া, আর আসল ঠিকানায় পেঁাছেই বিগড়ে যাবে ঠাণ্ডা লেগে, বড় আফ্‌শোষ। আরে বুদ্ধু, একটা কুর্তা ত' পরো। চুলগুলো মোছ। আরে উজ্‌বুক, ঠাণ্ডা লেগে এই খানেই মাটি নিতে হবে। খেয়াল আছে কি?

খুদাবক্স বলে,—পরন্তপ, তুমি স্নান করলে না? পরন্তপ বলে, ছো ছো, আমি কি তোমার মত অপবিত্র মানুষ, যে স্নান করতে হবে? পরন্তপ চৌহান স্নান করবে কেন? আরে শের কখনো স্নান করে?

সে রাতে কোন হানাদার আসবে না জেনে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল তারা। সহসা গ্রাম-বাসীদের আর্ত কোলাহলে ঘুম ভাঙে। খুদাবক্সরা ষোলজন। তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখা যায় আগুন লেগে গেছে পুবদিকে। গোলমালটা সেদিকেই বেশী।

পরন্তপ মহাবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনের কয়জনের ওপর।—লুঠেতরাজের আর সময় পেলে না? বলে বে-পরোয়া তরোয়াল চালায় হানাদারদের মধ্যে।

গ্রামবাসীদের লুঠ ক'রে ক'রে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল হানাদারদের। এই রকম প্রতিরোধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। সেই সাময়িক বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে খুদাবক্সরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকটা মিনিটের হিসেব হারিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা আগুন নিভাতে থাকে। হানাদাররা জন দশেককে রেখেই পালায়। তাদের তাড়া করে পরন্তপ। কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসে।

সকালবেলা যাত্রার মুখে বৃদ্ধ তহশীলদার ধন্যবাদ দিতে দিতে আসে। বলে, গ্রামের জোয়ানরা সব ঝাঁসী বা আশেপাশে গিয়েছে। গ্রামে রয়েছে যারা, তারা কি হানাদারদের বাধা দিতে পারে?

বড়োয়াসাগরের প্রান্তে এসে খুদাবক্সরা বিশ্রাম করে। রাতে আগুন জ্বালায় বেতোয়ার তীরে, আজ রাতেই যাত্রা করতে হবে ঝাঁসী।

আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্নাবান্না করছে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ ঝড়ের মতো দুর্বার হয়ে এগিয়ে আসছে বলে বোধ হয়। সতর্ক হয়ে অস্ত্র নিয়ে, যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। একপাশে সরে অপেক্ষা করে। শত্রু না মিত্র, না হানাদার, কে আসছে বিশ্বাস কি? পরন্তপ স্থির চোখে অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা ক'রে, আর রাঙা আলু তরোয়ালের ডগায় বিঁধিয়ে ঝলসে খায়।

প্রায় একশ' ঘোড়াসওয়ার। বেতোয়ার অপর প্রান্তে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আঁধার দিয়ে গড়া মূর্তির মতন। ওপার থেকে প্রশ্ন আসে গম্ভীর কণ্ঠে, কৌন্?

—বাইসাহেব কী ফৌজ।

—তব্ ঠাহ্‌র যাও।

জল পেরিয়ে চড়া পেরিয়ে তারা এগিয়ে আসে। পুরোধা ব্যক্তির দিকে দেখে উত্তেজনায় খুদাবক্সের কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। পুনর্বার আদেশ আসে : লাইনে দাঁড়াও, দেখ্‌ব।.. নাম কি?

খুদাবক্স ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে যায়। বলে, গোলামকে শম্‌সের পেস করতে হুকুম দিন ওস্তাদ, আমি খুদাবক্স।

—কোন্ খুদাবক্স?

—যেমন আমার একই ওস্তাদ, তেমনি আমি আপনার একই খুদাবক্স, দোছরা কেমন ক'রে হবে?

ঘোস নামেন ঘোড়া থেকে। খুদাবক্সও নামে। ঘোস তাকে টেনে আনেন বজ্র মুঠে ধরে আগুনের সামনে। পা দিয়ে ঠেলে দেন কাঠ। দাউদাউ ক'রে জ্বলে ওঠে আগুন। কথাগুলো রুদ্ধ হয়ে যায় ঘোসের মুখে, স্বেদাক্ত হাতে তার চিবুক তুলে বলেন, খুদাবক্স!

—ওস্তাদ!

আগুনের ধিকি ধিকি শিখাতে দু'জনে দু'জনকে দেখেন। সহসা গর্বিত খুদাবক্স, দুঃসাহসী বীর, কণ্ঠসহিষ্ণু পাঠান, বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরে ঘোসকে। ঘোসও জড়িয়ে ধরেন এই প্রিয় শিষ্যকে। অন্ধ আবেগে হাত দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে মমতা করেন খুদাবক্সকে। এতজনের সামনে অশ্রুবর্ষণ করতে এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না দু'জনের।

তখন এগিয়ে আসে পরন্তপ। এতক্ষণ ধরে সে নিস্পৃহভাবে রাঙা আলু খাচ্ছিল। গম্ভীর কণ্ঠে বলে, খাঁ সাহেব, আমি পরন্তপ চৌহান, আমার শম্‌সেরও পেশ করতে

অনুমতি দিন, আর এও পেশ করি যে এতদিনে এই বেওকুফ্ না-লায়েক খুদাবক্সকে আপনার হাতে পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি মিলল।

সাগ্রহে তাকে আলিঙ্গন করেন ঘোস। বলেন, চৌহান সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার ছুটির কোন কথা নেই। এতদিনে আপনি ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচিয়েছেন। এখানে আপনার ঠিক কদর পাবেন, আর ছুটি কখনো মিলবে না।

অপেক্ষমান সওয়াররা ঘোড়া থেকে নেমে একে একে এগিয়ে আসে। একটু সঙ্কোচ আর আনন্দের সঙ্গে সকলকে আলিঙ্গন করে খুদাবক্স। বাহুরাম, সাগর, দুলীচাঁদ, জওহর—উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে হৃদয়।

খুদাবক্স পরন্তপকে দেখে স্পষ্ট বোঝে একটা নাটকীয় কিছু করবার জন্যে সে ছটফট্ করছে। পরন্তপ তার আশঙ্কা অনুমান করে ধমক দেয়—এই আমাকে রুখবে না মোটেই! তারপর বলে, ভাইসব, এই আনন্দের জমায়েতে এস আমরা তরমুজ খাই।

—তরমুজ কোথায় পাবেন?

—কেন চরে? বলে পরন্তপ চট্পট্ চলে যায়। একটু পরেই দু'জন সওয়ারকে নিয়ে গোটা আষ্টেক তরমুজ নিয়ে আসে।

বালির ওপর বসে তরমুজ ভেঙে সবাই মিলেমিশে খায়। ঘোস খুদাবক্সের সঙ্গে বেশী কথা বলেন না। শুধু চোখ দিয়ে দেখে দেখে আনন্দ জানান। কথা যা বলেন তা পরন্তপের সঙ্গে। বলেন, সমানে ডাকু লুঠেরার উপদ্রব হচ্ছে এখানে জেনে বাই সাহেব একবার নিজে এসেছিলেন। গর্জন সিং আর ভানুকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে, কিছু ডাকুকে কয়েদ দেওয়া হয়েছে। আবার লুঠেরার উৎপাত হয়েছে জেনে আমরা এসেছি। এখানে কিছু রিসালা রেখে আজই ফিরব। কারণ ঝাঁসী ছেড়ে থাকলে আমার চলবে না।

ঘোসের কথাবার্তায় প্রবীণ যোদ্ধার গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য। চমৎকার মানানসই পোষাকে ঝাঁসীরাজের চিহ্ন, ছুঁচের কাজে বসানো। মুরেঠায় একটা সোনার ঝক্ঝকে চক্র পদমর্যাদার জানান দেয়। রিসালার ঘোড়া আর পোষাক দেখে বড় তারিফ আসে পরন্তপের মনে।

ঘোস কথাবার্তার জবাব দেন বুঝে বুঝে—হ্যাঁ, ফৌজ অন্ততঃ এগারো হাজার থাকবে। কামান আছে পঁয়ত্রিশটা। বাইশটা আমাদেরই ছিল, আর দু'টো এনেছিল ইংরেজ খুনের সময়ে পল্টন, নয়টা মিলেছে অরছার নথে খাঁর কাছ থেকে, দু'টো দিয়েছেন ঠাকুর মর্দন সিং। রসদ, টাকা, তোফাখানা, সব কায়েম বন্দোবস্ত। ফৌজ যে খুব তৈরী তা' নয়, তবু মন্দ নয়, রিসালাও ভাল। একটু কমজোরী হয়েছে আমার তোফাখানা। রিসালাতে রয়েছেন বাঈসাহেবা নিজে। আর তোফাখানাতে কিছু বহিনকেও পেয়েছি।

পরন্তপ প্রশ্ন ক'রে, তবে কি এই কথা সত্যি, যে ঝাঁসীতে লড়াই করছে মেয়েরাও?

একটু ভেবে ঘোস বলেন, প্রথমে সবাই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু এখন দেখেছি কি বড় কাজে লেগেছে মেয়েরা।

জবাব দেয় না পরন্তপ, তবু বোধ হয় তার চোখের কোণে জেগে থাকে সন্দেহ।

ভোর-রাতের মুখে তারা রওনা হয় ঝাঁসী। পথে দেখা যায় ক্ষেত-কে-ক্ষেত খালি হয়ে গেছে, গাছে পাতা নেই। একেবারে রিক্ত হয়ে গেছে ভূপ্রকৃতি।

পরন্তপ, ঘোস আর খুদাবক্স পাশাপাশি চলেন। খুদাবক্সকে দেখে দেখে অবাক মানেন ঘোস। এই লোকটি তাঁর একান্ত অপরিচিত। বিদায় নিয়ে যে চলে গিয়েছিল, সে

এক তরুণ যুবক। আজকের খুদাবক্সের রঙ অনেক জ্বলে গিয়েছে, শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রা তার শরীরটাকে পিটিয়ে দিয়েছে, দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় অনেক স্থির ও একাগ্র হয়েছে খুদাবক্স।

ঝাঁসীর কেল্লা দূর থেকে প্রতিভাত হয় বিকেলে। আকাশের গায়ে বোধ হয় যেন কালি দিয়ে লেখা কেল্লার বহিঃরেখা। দেখে খুদাবক্সের অদ্ভুত ভাবান্তর হয়। ঘোস বাহুরামকে ডাকেন। ঘোসের আজ্ঞা কানে কানে শুনে বাহুরাম তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। মোতিকে খবর দিতে হবে।

ঝাঁসীর কাছে এসেই, ঘোড়া সংযত ক'রে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন সবাই। একটু পরেই দূত এগিয়ে এল, ঘোসকে কি বলল, ঘোস বললেন, আমরা উনাও গেট দিয়ে ঢুকব। অংরেজের ফৌজ রয়েছে বিশ মাইল দূরে।

সতর্ক দৃষ্টিতে আঁধার দেখে দেখে সহরে ঢুকলেন তাঁরা—রাত আটটা হবে।

ঘোস খুদাবক্সকে একান্ত করে বলেন, আগে রানীকে'ত ভেট কর।

স্বীকার ক'রে খুদাবক্স।

রানীমহালে প্রবেশ ক'রে সোজা দরবার ঘরের দিকে চলেন ঘোস। উত্তেজনায় স্পন্দমান হয়ে ওঠে খুদাবক্স। দরবার ঘরের সামনে স্মিত হেসে পথ দেখায় দুইজন পাঠান রমণীর পোশাকে সজ্জিতা তরুণী। আজ তারাও যোদ্ধার সাজে সজ্জিত।

পাঠান যুবকের সজ্জায় সজ্জিতা রানী দ্রুত এগিয়ে আসেন, ঘোসকে দেখে বড় আশ্বস্ত হয়েছেন বলে বোধ হয়। ঘরের মেঝেতে আলো জ্বলছে, একটি মানচিত্র এবং কিছু চিঠিপত্র পড়ে আছে। ঘোস বলেন, সরকার, সাঁইয়ার দরোজায় 'অর্জুন' কামান চালাবার লোক পেয়ে গেছি।

খুদাবক্স তরবারি পেশ করে। রানী সবিস্ময়ে দেখেন এই শালপ্রাংশু বীরদেহ যুবককে, ভাল লাগে তাঁর। এই রকম না হলে পুরুষ! যে প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, বহুৎ খুব, কিন্তু বড়োয়াসাগরে পেলেন কি?

—জী সরকার। তারপর বলেন, এখন একে বিশ্রাম করতে হুকুম দিন, আমি আপনাকে সব বলছি।

রানী স্মিত হেসে তাকে যেতে অনুমতি দেন। তখন কথা বলেন ঘোস : ধীরে ধীরে খুদাবক্সের সম্বন্ধে সব কথা বলে যান। সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন রানী। বলেন, ঠিক আছে। কিছু ভাববেন না আপনি। আপনার বিশ্বাস থাকলেই হল। জানেন কি, চন্দন সিং যে গুপ্তচর সেই খবর বেরিয়েছে! কিছু চিঠি মিলেছে, সে কোন্ পহেলা ব্রিগেডওয়ালা ষ্টুয়ার্টকে খবর দিচ্ছে আমার কামান ও বন্দোবস্তি সম্বন্ধে। চিঠি বাজেয়াপ্ত ক'রে কয়েদখানায় রেখেছি। বড় হুঁশিয়ারীর দরকার।

দু'জনে দু'পাশে বসে পড়ে মানচিত্রে ইংরেজ সৈন্যের অগ্রগতি দেখেন। অভিজ্ঞ হাতে লাল পেনসিলে দাগ দিয়ে টেনে আনেন রানী।

এইবার মোতি! পথ দিয়ে চলতে চলতে পথকে দৃষ্টি দিয়ে ছুঁয়ে অভিনন্দন ক'রে খুদাবক্স। এই পথ নিত্য মোতির চরণের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে অপর হাতে চিবুক ছুঁয়ে থাকে খুদাবক্স। তীক্ষ্ণ নীল চোখ ধূসর হয়ে গেছে কোমল মমতায়।

খবর পেয়ে গেছে মোতি বাহ্‌রামের মুখে। শুধু ত' তাই নয়, প্রতিনিয়ত সে যে খবর পাঠিয়েছে মোতিকে পলে পলে, অনুপলে, সে খবরও কি মোতি পায়নি?

লগ্ন চেয়েছিল খুদাবক্স, তাই সমস্ত সময়টা হয়ে গেল লগ্ন, এই নগরী হয়ে গেল উৎসবের ঘর, সেই গৃহে চলেছে খুদাবক্স। আর অল্প পথ তারপর সেই বাড়ী।

পথে সংগ্রামের প্রস্তুতি, জনকোলাহল, আলো, কিছুই চোখে পড়ে না খুদাবক্সের। এ সমস্তই যেন স্বপ্ন। সত্যি শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর সত্যি হচ্ছে ক্রমস্ফীয়মান দূরত্ব।

একটু ফাঁকা পেয়েই জোরে ঘোড়া চালায় খুদাবক্স, মোড় ঘুরতেই চোখে পড়ে সেই অতি পরিচিত নাঁচু দোতলা বাড়ী। সদর দরওয়াজা খোলা, পাশে কুলুঙ্গীতে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

ঘোড়া থেকে নামে খুদাবক্স। পা ভারী ও অবশ বোধ হয়, অদ্ভুত দুর্বল মনে হয় নিজেকে। কানপুরে ইংরেজ সাহেবের হাতের গুলী লেগেছিল তার কাঁধে। মুহূর্তের জন্য সে মৃত্যুকেই দেখেছিল। তখন'ত এ রকম বোধ হয়নি। মনে হয় কারো সাহায্য পেলে হ'ত।

একেবারে নিস্তব্ধ বাড়ী। সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকে খুদাবক্স। ঘরে ঘরে বড় জোর একটি ক'রে প্রদীপ আছে, তাতে আলো আর আঁধার মেশানো একটা সুন্দর পরিবেশ হয়েছে।

নিরাভরণ কক্ষগুলি পেরিয়ে সে বড় ঘরে প্রবেশ করে। আবছা আলোতে চিত্রার্পিতা রমণীকে বোধ হয় এমনিই কিছু মৃদু আলো দিয়ে গড়া। শুভ্রবসনা, রুক্ষ বেণীধরা, নিরাভরণা, শুধু ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দুটি কথা বলে। কথা বলে, স্বাগত জানায়, ঠোঁট এত কাঁপে যে কথা আসে না।

যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে। আকুল বাহুবিস্তারে এগিয়ে আসে খুদাবক্স। সব কথা, সব স্বপ্ন এক হয়ে তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয় শুধু একটি শব্দ—মোতি!

বিশ্বাসঘাতকতা করে মোতির চরণ। টলে পড়ে যেতে চায়। তখন বলিষ্ঠ দুই হাতে তাকে টেনে নেয় খুদাবক্স। বুকের কাছে ধরে ক্ষুধিত পিপাসায় বলে—মোতি, মোতি, মোতি। গলা ভেঙে যায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, তবু বলে মোতি, মোতি, মোতি—হাজার-বার উচ্চারণেও যেন হবে না। রেশমের মত কোমল, সুরভিত কেশে মুখ গুঁজে সেই নামই বলে, উষ্ণ শুভ্র-সুন্দর গ্রীবাকেও সেই কথা বলে। তৃষিত ওষ্ঠাধর শুধু নামই উচ্চারণ করে, যতক্ষণ না মোতির তপ্ত অধরে এসে বিলীন হয়ে যায় একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চুম্বন। তৃষিতের মত পান করে খুদাবক্স আর মোতির অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদ সেই সঙ্গে মিশে মিশে যায়।

জগৎ সংসারের দিশা ঠিকানা হারিয়ে যায়। কথা, অভিমান, অভিযোগ, এতদিনের তিলে তিলে রচা কত স্বপ্ন আর কল্পনা, সবই মিথ্যা হয়ে যায়। চরম সত্য হয়ে ওঠে শুধু তারা দুইজন।

যুদ্ধ, আশাভঙ্গ, মৃত্যু মিথ্যে হয়ে যায়, নগরীর দ্বারে যে মৃত্যু অপেক্ষমান, তার কথা মনে হয়ে প্রেম আসে আরো আকুল হয়ে। বড় শুভলগ্ন, বড় সুন্দর সময়। সহসা দেশ, কাল, বিধিনিষেধের ক্ষুদ্র সংস্কার চৈতী বাতাসে উড়ে বে-পাত্তা হয়ে যায়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে পটভূমিকায় আকাশকে আরো বিশাল মনে হচ্ছে, নিজেকে মনে হচ্ছে

একেবারেই মুক্ত, স্বাধীন। এই সময় প্রেমও সমস্ত তুচ্ছতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই ত' পরমলগ্ন।

নিজেকে মুক্ত ক'রে খুদাবক্সকে হাত ধরে খাটে বসায় মোতি। গানে গানে কতবার সে এই আসন কামনা করেছে, আজ সত্যিই বসে মাটিতে নতজানু হয়ে। পা থেকে উন্মোচন করে নাগরা। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে খুদাবক্সের কোলে মাথা রেখে কাঁদে। তাকে বাধা দেয় না খুদাবক্স। মোতির মধ্যে তার মা-কে এবং আরো অনেকজনকে যেন চেনে খুদাবক্স। মেয়েদের ভালোবাসাই হয়তো এমনি, অনেক অশ্রুমোচনে হয়তো গ্লানি কেটে যায়, নির্মল হয় প্রেম। শুধু আসঙ্গ বাসনায় মদির ও লোভনীয় নয়, মেয়েদের কামনায় প্রেম হতে চায় নির্মল, পবিত্র ও সুন্দর। সেই জন্যই কি অশ্রুমোচনের প্রয়োজন হয়? আঘাত না পেলে যেমন পৃথিবী ফুল ফলের ভাষায় কথা কইতে চায় না, উৎসারিত ক'রে দিতে চায় না জলের গোপন উৎস, মেয়েরাও হয়তো তেমনই সুন্দরতম হয় দুঃখ জানলে। চরম অনুভূতি প্রেম, সেও বেদনার পেয়ালাতেই ভরে পান করতে হয়।

মোতিকে তুলে ধরে খুদাবক্স। পাশে বসায়। কথা হয় না। চেয়ে দেখে অনিমিখ। সেই ললাট, সেই ঈষৎ উন্নত গ্রীবা, সেই ওষ্ঠ, অধর, সেই চোখ। অযত্নে বেণী সংবন্ধ কেশ, নিরাভরণ দেহ, অনামিকায় একটি প্রবালের অঙ্গুরী। মনে পড়ে এই অঙ্গুরী সে একদিন অধরে স্পর্শ করেছিল।

মোতির কমল নয়ন থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ে। বলে, কতদিন দেরী করেছ খুদাবক্স?

সান্ত্বনা দেয় খুদাবক্স। গভীর প্রেমে ধীরে ধীরে হাত বুলোয় মাথায়, পিঠে, কপালে। বলে, খত্ পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—লিখেছিলাম ত' সময় হলেই আসব মোতি।

—আর ত' চলে যাবে না?

প্রিয়তমকে দেখে আর দুইচোখের দৃষ্টি দিয়ে বরণ ক'রে মোতি। কত শান্ত, স্থির, একাগ্র এক পুরুষ। কোমল মমতায় খুদাবক্সের হাতে হাত বুলোয় মোতি। নিরাভরণা প্রিয়া। মোতির খালি হাত, কান, আর গলা দেখে মনে ব্যথা পায় খুদাবক্স। মোতি বোঝে। হেসে বলে, কি এনেছ আমার জন্যে?

—নিজেকেই এনেছি মোতি।

মোতি মাথা নাঁচু ক'রে এ সৌভাগ্য স্বীকার করে। খুদাবক্স একটু হেসে বলে, আর একটা জিনিষ কবে থেকে যে বয়ে বেড়াচ্ছি। এক দুখিয়ারীর জিনিষ। তোমার নাম করে দিয়ে গেছে সে।

—দাও। অঞ্জলি পাতে মোতি।

জামার ভেতরে হাত চালিয়ে দেয় খুদাবক্স। বের করে একটা ময়লা রুমাল। বাঁধন খুলে মোতির চোখের সামনে তুলে ধরে একজোড়া কানফুল। লবঙ্গফুলের মতো ছাঁদ। মাঝখানে একটু লাল মীনার কাজ। সঙ্গে সরু সোনার চেন। এমনি গহনা পরে গাঁয়ের ছোট ছোট বৌ-রা। বৌ-এর কান ছিঁড়ে যাবে তাই এই শিকলি।

মোতির হাতে তুলে দেয় গয়না খুদাবক্স। বলে, মা দিয়ে গেছেন তোমাকে। শ্রদ্ধায় মাথায় হাত তুলে নতি জানায় মোতি।

তারপর আয়না সামনে ধরে কানে পরে। ঋজু হয়ে দাঁড়ায় খুদাবক্সের সামনে। আর একখানা মুখ মুহূর্তের জন্যে মোতির মুখখানা আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। সেই মুখ ঈষৎ শীর্ণ, পাণ্ডুর, কপালে একটা উল্কীর টিপ, চুলগুলি কাঁচা পাকায় মেশানো রুক্ষ। এই কানফুলের সঙ্গে সেই মুখের স্মৃতি জড়ানো। মায়ের মুখ। তারপর সেই মুখ মিলে যায় মোতির মুখে। সুন্দরতর ক'রে তাকে। সলাজ হাসে মোতি। খুদাবক্সও একটু হাসে। তারপর দু'জনে এসে পাশাপাশি দাঁড়ায় জানলায়। ব্যস্ত রাজপথ দেখতে দেখতে খুদাবক্স বলে, মা দেখলে আজ বড় খুসী হতেন মোতি।

দু'জনেই চুপ ক'রে যায়। সেই মধুর ও করুণ নীরবতার ওপর নক্ষত্রের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন অ-দেহী আত্মার কল্যাণ কামনা ঝরে ঝরে পড়ে।

নীচে কার সাড়া পাওয়া যায়। অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখেই হাজির হয় বাহ্‌রাম।

সলাজ হাসে মোতি। বাহ্‌রাম একখানা চিঠি দেয় তাকে। বলে, জোরে পড়ো বহিন্‌। পড়তে গিয়ে মুখে হাত চাপা দেয় মোতি। ঘোস লিখেছেন : মোতি, যে বেওকুফ না-লায়েককে তোমার কাছে পাঠিয়েছি, তাকে আজ রাতে আর কেল্লায় আসতে হবে না। কয়েদে রাখো।

খুদাবক্সও চিঠি পড়ে খুব লজ্জা পায়। মোতি তাড়াতাড়ি একটু দাঁড়াও বাহ্‌রাম ভাই, ব'লে চলে যায় ঘরে। বাহ্‌রাম বলে, ওস্তাদের ত' পুরো খেয়াল নেই, নিজেই আসছিলেন, পরন্তপ খুব ঠেকিয়েছে। এখন দু'জনে কেল্লাতে দক্ষিণ বুরুজের পিছনে নিশান চৌকিতে বসেছেন 'ঘনগর্জ্‌'-এর সামনে, আর যে সব গল্প হচ্ছে, তা শুনে আমরাই ঘাব্‌ড়ে যাচ্ছি। হাসির হর্‌রা ছুট্‌ছে। ভীড় জমাতে ভয় পাচ্ছে তবু আশেপাশে ফিরছে সব। পরন্তপ ওস্তাদের গোঁফ মেপে দেখছে আর চিৎকার ক'রে চব্বিশ বাঁও, চল্লিশ গজের গল্প শোনাচ্ছে। রঘুনাথজী পুরী মিঠাই আর রাবড়ী চালান দিচ্ছেন।

দু'জনেই হাসে। তারপর বাহ্‌রাম বলে, না জানি এই লড়াইয়ে কি হবে, কাল থেকে আর দিনরাতের নিশানা থাকবে না। তোমাকে আরাম করতে হুকুম দিয়েছেন বাঈসাহেব নিজে! তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, না খুদাবক্স, যা করেছ, করেছ, আর কষ্ট দিওনা। কেন কি, খুব ভালো মেয়ে না হলে তোমার মত একটা উজ্‌বুক গাঁওয়ারের জন্যে জীবনটা সদ্‌কা ক'রে বসে থাকত না এতদিন।

মোতি একটা ছোট থলিতে কিছু মেওয়া ও ফল নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রে, কি কথা হচ্ছে?

—কিছু নয়। বলে বাহ্‌রাম ফলগুলো ভরে নেয় পকেটে। বলে, এখনি কিছু বুন্দেলা কিষাণ এল, তাদের বন্দোবস্ত করব। এরা রাজপুত ত', মোটেই পরোয়া করে না। যে যার কাস্তে বল, ছোরা বল, যা মিলেছে নিয়ে, মাথায় কম্বল চাপিয়ে চলে এসেছে হৈ হৈ করে। কেউ হচ্ছে বুড়ো, কারো নাগরা জোড়া নৌকোর মতন, খুব হয়েছে বটে কারবার! তারপর ওদের ভাষাতে কোন 'আপনি' নেই—কুঁয়ার রঘুনাথ সিংকে বলছে—তুম্‌ জরা ইধার আও, দিলীপ সিং পওয়ারকে বলছে—তুম্‌ পানি পিলাও—বোঝ!

এইসব উচ্চ পদস্থ সামন্ত সর্দারদের কথা মনে ক'রে খুব হাসে মোতি। বলে—ঠিক হয়েছে। যা আপনি আপনি আর দরবারী কথাবার্তা দিলীপজী'র!

সকলেই হাসে। বিদায় নেবার আগে বাহ্‌রাম বলে,—এই গাঁওয়ারটাকে কাল ধোবিখানায় পাঠিয়ে দিও মোতি, ভালো ধোলাই ক'রে সাফা করতে হবে। ঝাঁসী আসবে বলে আর স্নান করেনি এরা। পরন্তপ কথা কইছে ত' গোঁফ থেকে ধুলো উড়ছে। তাই দেখে

চৌহানদের ওপরে চটে যাচ্ছেন রঘুনাথজী বোধ হচ্ছে। একটা স্নান করাবার মৎলব করছেন মনে হয়। বাহ্‌রাম চলে গেলে মোতি খুদাবক্সকে গোসল্‌খানায় নিয়ে যায়। জামা কাপড় নিয়ে যায়, সুগন্ধি উষ্ণ জলের গন্ধ আসে। মোতির মুখের দিকে চেয়ে খুদাবক্স বলে, আমার জামাকাপড় কেমন ক'রে পেলে মোতি?

একটু হেসে মোতি বলে, তোমার পেটি'ত আমার কাছে রেখেছিলেন ওস্তাদ, তাতে যে মাপ ছিল, তা' থেকে কিছু বানিয়েছিলাম।

—কবে?

—সেই ছ'মাস আগে ওস্তাদকে লিখেছিলে, আসতে পার, মনে নেই? তখন। কেন ঠিক হবে না?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে কেন দিলেন ওস্তাদ? কি বা ছিল পেটিতে!

—কেন, তুমিই ত' লিখেছিলে কোন কাঙালকে দিতে। তাই আমি নিয়েছি।

ওস্তাদকে লেখা সেই প্রথম খত্‌। মনে করে খুদাবক্স গভীর প্রেমে মুখ তুলে দেখে মোতিকে। বলে, তুমি কাঙাল মোতি?

মোতি বলে,—এখন'ত নই।

সুরভিত উষ্ণ জলে স্নান করে ক্লান্তি ধুয়ে যায়। তারপর সাদা চিপা পরে খুদাবক্স খাস্‌ পাঠানী কায়দায় লম্বা কুর্তা পরে, গলার পাশে জরির ঘুন্সি বসানো। পায়ে কিছু পরে না। হাল্কা লালরঙের চন্দেরীর মুরেঠা বাঁধে খুব কায়দা ক'রে। পাশের ঘরে বসে পোষাক খুঁজে পায় না মোতি। রঙ, জরি, রেশম, কিছুই পছন্দ হয় না তার। তারপর বেছে নেয় চাঁপাফুল রঙের পেশোয়াজ ও ওড়নী। আয়না সামনে ধরে বেণী বাঁধে। মুখখানা ঘসে ঘসে লাল করে তোলে। সুর্মা টানে চোখের কোলে। ওড়নীটা টেনে গায়ে জড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আয়নায় দেখে। আয়না ঢেকে খুদাবক্সের ছায়া পড়ে। হাত ধরে তাকে নিয়ে আসে খুদাবক্স। কুর্শীতে বসিয়ে মুখখানা তুলে দেখে। চূর্ণকুন্তল দু'টো একটা চিরুনী দিয়ে ছড়িয়ে দেয় কপালে। ওড়নীটা মাথায় তুলে দেয়। একটু কৌতুক, আর অনেকখানি একাগ্রতা ফুটে ওঠে তার মুখে চোখে।

মোতি ঈষৎ অস্ফুট স্বরে বলে, মনে পড়ে খুদাবক্স?

—হ্যাঁ মোতি।

একপলকে দু'জনের চোখে ভেসে ওঠে সেই হোলির দিন। প্রথম সাক্ষাতের শুভলগ্ন। সেদিন আকাশ, বাতাস, পলাশ, শিমুল আকুল হয়ে রচনা করেছিল বসন্তের উৎসব। সে ছিল প্রথম যৌবন। ফুলওয়ালীর ডালার চাঁপাফুলের গন্ধটা অবধি অনুভবে আসে খুদাবক্সের। সেদিন এই পোষাক পরেছিল মোতি।

খুদাবক্স বলে, সেদিন কিন্তু চুল খোলা ছিল মোতি। আর গলায় ছিল এক মুক্তার হার। মনে পড়ে মোতি? বল তো—

তার একাগ্র দৃষ্টির সামনে মোতি যেন গলে গলে যায়। থরথর ক'রে কাঁপে তার মন। খুদাবক্স দুই হাতে মোতির মুখ তুলে ধরে একাগ্র পিপাসায়। বিভ্রান্ত হয়ে যায় মোতি। তখন একটু হেসে আশ্বস্ত করে খুদাবক্স। বলে, আরো একটা কথা বলি। মোতি বলে, বল। তীক্ষ্ন নীল চোখে কৌতুকের সামান্য ঝিলিক দিয়ে খুদাবক্স বলে, আপনার কি আর এক কথা স্মরণ হয়?

—কোন কথা?

—যে এক নজরের আঘাতেই ঘায়েল করেছিলেন? সেইদিন থেকেই ত' বান্দা আপনার অধীন।

—জী। বলে বন্দীকে স্বীকার ক'রে মোতি মধুর হেসে কাঠের কারুকার্য খচিত কাশ্মিরী পেটি খুলে এনে দেয় লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির কল্‌কা, আর নক্সা বসানো একটি হাতকাটা আঙিয়া। বলে, ছয়মাস ধরে কাজটা করেছি নিজে হাতে, জান?

পরিয়ে দেয় খুদাবক্সকে। সত্যই চমৎকার দেখায়। মোতিকে টেনে কাছে আনে খুদাবক্স। আয়নার ওপরের জালিকাজের ঢাকনা তুলে দেয়। দু'জনের ছায়া পড়ে। যৌবন ও প্রেম দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। সেই সমৃদ্ধ ছায়া বুকে ধরে ধন্য হয় কাঁচের আয়না। দু'খানা মুখেই সুখ স্বপ্ন কম্প্র আনন্দে বিরাজ করে। মোতি বলে, কাল, এই সময় কোথায় ছিলে?

—নদীর জলে। পাথরে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। কিন্তু গত কাল, আর আগামী কালের কথা ছাড়। আজ, এখন, এই সময়টাই সত্য। কতবার শেখালাম মোতি, তবু শিখলে না?

—মাপ কর খুদাবক্স।

—এত সহজে নয় মোতি, পরে।

খুদাবক্সের মুখের দিকেও চায় না মোতি। পাশের ঘরে নিয়ে যায়।

গালিচার দুইপাশে দু'টি মোমবাতি জেলেছে মোতি, মাঝখানে রেখেছে সাদা রেশমী সুতোর জালিকাজের রুমাল ঢাকা কয়েকখানা রেকাবী। পাশে রুপোর সোহ্‌রাইয়ে সরবৎ। দেখে অবাক মানে খুদাবক্স। একটু হাসিও পায়। বলে, গত কয়মাস আমরা কি খেয়েছি জান? কিছু আলু মিলেছে ত' খুব ভাগ্য মেনেছি। রুটির আটা মিলেছে ত' আলু মেলেনি। শিকার মিলেছে'ত রান্নার বাসন মেলেনি। আবার তিনদিন বাদে প্রথম কয়টা রাঙাআলু মিলল'ত খাবার সময় মিলল না। দুষ্মণের ফৌজ আসছে শুনে, ফেলে রেখেই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু এ কি করেছ মোতি? এত কি আয়োজন করেছ?

—কি করেছি? মনে মনে মোতি ভাবে তোমার জন্যে কোন আয়োজনই যথেষ্ট নয় খুদাবক্স। আমার আর কি ক্ষমতা? সমস্ত দুনিয়ার ভাণ্ডারও যদি এনে দেয় কেউ, তবু ত' আমার মন মানবে না যে যথেষ্ট হয়েছে!

বড় যত্ন করে মোতি। এই সঙ্গীন সময়ে কত কষ্ট ক'রে এইসব জোগাড় করেছে সে, ভেবে কষ্ট হয় খুদাবক্সের। মমতা জাগে মনে। মোতি সযত্নে সরবৎ ঢেলে এগিয়ে দেয় পেয়ালা। ফল ও বাদামের রেকাবির ঢাকনা তুলে নেয়। গরমজলের বাটি এগিয়ে দেয় হাত ধোবার জন্যে। মোতির যত্নে, তাদের গ্রামের ঘরের সামান্য আয়োজন নিয়ে মায়ের যত্নের কথা স্মরণ ক'রে খুদাবক্স। মনে হয় এমনি ক'রে মোতি তাকে যত্ন করবে জানলে কত নিশ্চিন্ত হতে পারত তার মা।

মোতির ঘরের জানলা খুলে দিতে হু হু ক'রে পাহাড় প্রান্তর ধোয়া চৈতালী বাতাস আসে। প্রদীপ নিভে যায়।

নীচু জানলার পাশেই শয্যা। খুদাবক্স শোয় হেলান দিয়ে। তার পাশেই বসে মোতি। বাতাসে মোতির চুল ও পোশাকের আতর সুবাস ছড়ায়। মোতি অনুমতি চায়। বলে, এতটুকু আরাম ক'রে দেব? বারণ করে খুদাবক্স। একটু পরে আস্তে মোতি বলে, একটা কথা বলব?

—বল।

সকরুণ মিনতি ভরা কণ্ঠে মোতি বলে, দেখ, এই কথা আজ না বললে আমার মুক্তি নেই। কেননা তুমি'ত জান এইরকম সময় আর মিলবে কিনা জানা নেই।

—বল মোতি।

—আচ্ছা তুমি আমায় মাফ করেছ তো?

খুদাবক্সের পায়ের ওপর হাত রাখে মোতি। কণ্ঠস্বরে মনে হয় অশ্রুর আভাস আছে নয়নে।

মাথার নীচে দুই হাত দিয়ে হেলান দিয়ে শুয়েছিল খুদাবক্স। বলে, এদিকে তাকাও মোতি।

মোতি তাকায়। স্বল্প জ্যোৎস্নার আলোতে দেখা যায় ওর আঁখিপল্লব সিক্ত। ধীর, গম্ভীর, ঈষৎ উদাস, অথচ কোমল মমতা ভরা কণ্ঠে খুদাবক্স বলে, কিছু কথা তোমাকেও বলি মোতি, সময়ের কথা ভাবি না, কিন্তু এই হচ্ছে ওয়াক্‌ত। তুমি কি বিশ্বাস করো মোতি, আমি সেই কথা মনে ক'রে রেখেছি? হ্যাঁ, তখন বড় ঘা লেগেছিল, মনে হয়েছিল সহ্য করতে পারব না। কিন্তু কি জানো মোতি, তোমাকে আমার বাপের কথা অনেক বলেছি। রক্তে রক্তে আমি কিষাণ। জমি বছরের পর বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাকে স্নিগ্ধ করি, সে ফৈলাদ্ করে, ফুলফল দেয়, নয়তো ছাড়ি না। তুমি আঘাত দিয়েছিলে, তবু তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না আমি। ওস্তাদের খত্ মিলবার আগেই আমার মন তৈরী হয়েছিল মোতি, আর কাউকে তোমার জায়গা দিতে পারতাম না। তোমাকে একবার ভালবেসে সেই মন নিয়ে কোন খেলাও খেলতে পারতাম না।

অনেক কথা আমি বলতে পারি না তুমি জান, আমি সব সময় ভাবতাম তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে, বুঝে ক্ষমা করবে, অপেক্ষা করবে। কোথা থেকে এত বিশ্বাস আসত বল। সে বিশ্বাস'ত তুমিই দিয়েছিলে।...বড় অদ্ভুত মন আমার, একবারই ভালবাসতে পারি, আর সেই কথাই ধেয়ান হয়ে থাকে জীবনে। তাতেই সময় কেটে গেল, অনেক প্রেম, অনেক অভিজ্ঞতা যারা সঞ্চয় করতে পারে, তাদের সময় কেমন করে মেলে জানি না। তুমি ভাব, আমি কালকের কথা ভাবি না। কি ভবিষ্যত ভাবব বল। গত কয় বছর কত মৃত্যু, দুঃখ, শোক আর অনাহার দেখলাম। মানুষের জীবনের কথা কি বলব, আমার জীবনেই দেখলাম কত উত্থান পড়তি। হিসেব ক'রে বাঁচলেই দেখি সব বে-হিসেব হয়ে যায়, আর যেখানে কোন প্রত্যাশা ছিল না, সেখানে সব আশা ছাপিয়ে সৌভাগ্যের পিয়ালা উছ্‌লে পড়ে, এই দেখে শিখেছি যে সবই জীবনের মুবারক, সবই কৃতজ্ঞ হয়ে নিতে হবে।

খুদাবক্সের কথায় তার সমস্ত জীবনের অরমাঁ যেন খুঁজে পায় মোতি। অরমাঁ বা মরমের কথাও'ত সেই কথাই বলে। খুদাবক্স আরো কথা বলে। ব্যাকুলতা ভরা তার কণ্ঠ। যেন এই কথাগুলি এই রাতে বলতে হবে, তাই চাঁদ উঠেছে এতক্ষণ পরে মেঘের ওড়নী সরিয়ে রেখে, তাই ঝোড়ো বাতাস মুঠো মুঠো জুঁই ফুলের গন্ধ আনছে মেহ্‌দীবাগের মালঞ্চ থেকে। সে বলে, আজ রাতে যে ইংরেজ ফৌজ কুড়ি মাইল দূরে আছে, কালই হয় ত' সে এসে পড়বে কেল্লার সামনে। তখন এই সব কথা বলতে যাব না মোতি। তাই বলি, তুমি সে কথা আর বোল না।

—আচ্ছা খুদাবক্স। একটু ভেবে মোতি বলে, তুমি কিছু অংরেজ ফৌজ নিশ্চয় দেখেছ? একটু হাসে খুদাবক্স। বলে, পহেলা দেখেছিলাম ছোট বেলায়।

তার মুখে হাত চাপা দেয় মোতি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে তার। খুদাবক্স তার সেই হাতখানা ডান কাঁধের ওপর রাখে। বলে, আঁধারে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, এইখানে একটা মস্ত চোট আছে। কানপুরে গুলী খেয়েছিলাম খুব জোর।

হাত বুলিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স বলে, খুব দেখেছি গত কয় মাসে। হিম্মৎদার তারা, মানতেই হবে। আর খুব নিয়ম মানে। নইলে এইভাবে একটার পর একটা লড়াই জিতে নিচ্ছে?

—শুনেছি যে বড় খুনজখম করছে?

—সে কথা থাক মোতি। এখন কি সেই কথা বলবার সময়? খুদাবক্সের বাহুতে হেলান দেয় মোতি। মোতিকে বাহুতে বন্দী ক'রে কাছে টেনে আনে খুদাবক্স। একেবারে বক্ষলীন ক'রে তার হৃৎস্পন্দন শোনে। একের বুকের দোলা লেগে অপরের হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়। কেল্লা থেকে কামান পাল্লা ঠিক করছে, সেই ফাঁকা আওয়াজ আসে। রাতে যারা চৌকি দেবে, সেই সব রিসালা, সিপাহী ও তোফাখানার লোকরা চলাচল করে সদর রাস্তা দিয়ে। ঘণ্টা বেজে ঘোষণা করে রাত—বাজল দুটো।

সমস্ত দুনিয়াটাকে দূরে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। বুকের ভেতর থেকে মহাবুভুক্ষায় তরঙ্গায়িত হয় প্রেম। হাজারটা হাতে খুদাবক্সকে আঘাত করে। অভূতপূর্ব বেদনা ও আবেগের এক মিশ্র তরঙ্গ উদ্বেল হয়। রক্ত চঞ্চল হয়। তার বহুদিনের প্রতীক্ষা এই চরম আনন্দ ও বেদনার মুহূর্তে সার্থক হয়। আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রিয়াকে আপন ক'রে নিতে চায় পুরুষ। পরম সময়। চরম শুভলগ্ন। দুরন্ত আবেগে খুদাবক্স বলে, মোতি, মোতি, মোতি। ফুলের মালার মতই বক্ষলগ্ন হয়ে থাকে মোতি, কথা বলে না।

ভাষাহারা হয়ে যায় রাত।

ঈষৎ হেলে পড়ে চাঁদ। বড় যত্নে খুদাবক্সের কপাল থেকে চূর্ণ কুন্তল সরিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স সপ্রেম দৃষ্টিতে চায়। বলে, কি ভাবছ?

—কিছু নয়।

—মোতি?

—কি?

—তুমি গান গাইতে!

—হ্যাঁ।

—কোন গান?

—আমি বলতে পারব না। লজ্জা করে।

—আমি শুনতে চাই।

—বড় না-ছোড় তুমি খুদাবক্স, বড় তোমার জেদ।

—হ্যাঁ জী, কম জেদী হ'লে ত' তোমার সঙ্গে পারতাম না, তুমিই কি কম?

একটু হাসে মোতি। চোখে মুখে অপরূপ লাবণ্য।

খুদাবক্স বলে, গান কর।

—এক গান তোমার মনে আছে খুদাবক্স?

—বুলবুল্ মত্ রোঁ ইহাঁ—? নিশ্চয়।

—সেই গান গাই।

—না মোতি।

—বেশ। তবে সেই গান গাইব, আমার গুরুজী আমাকে যে গান দিয়েছিলেন।

—সেই অন্নময়ের গান? যাকে ইনাম দিয়েছিলে?

—কেমন ক'রে জানলে?

—বড়োয়াসাগর ছেড়ে আসতে ওস্তাদ বলেছেন।...বড় অন্যায় করেছি আমিও মোতি, আর একবার মাফ চেয়েছিলাম মনে পড়ে? সেই চাঁদনী রাত, হোলিতে হল্লা হচ্ছে!

সব মনে পড়ে মোতির। মানুষ ত' ছিল না কাছে, স্মৃতি ধরেই বসেছিল সে। তসবীর মালার মত সেই স্মৃতির মালা আঙুলে ক'রে গুণত। জবাব না দিয়ে গান ধরে মোতি গুরুজীকে স্মরণ ক'রে—তেরে কারণ ময় সজন্ যোগান বন্ জাউঁ। মনে হয় স্মিত হাস্যে তাকে আশীর্বাদ করছেন গুরু চন্দ্রভাণ।

খুদাবক্স বলে, এই গান তুমি গাইতে? সম্মতি জানায় মোতি।

—কেন মোতি? যোগান্ কেন হবে তুমি? আমিত তোমারই ছিলাম মোতি, এক-দিনের জন্যেও বিস্মৃত হইনি, বিশ্বাস করো।

বিশ্বাস ক'রে মোতি। প্রিয়তমের বাহুকে উপাধান ক'রে পরম সুখে লীন হয়ে থাকে।

আঁধার তরল হতে থাকে পূব গগনে। খুদাবক্স বলে, একটু ঘুমোও মোতি। রাত শেষ হলো!

বাধ্য বালিকার মতন কথা শোনে মোতি। চোখ বুঁজে থাকে। জানলায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা মুখে চোখে নিতে নিতে খুদাবক্স কৃতজ্ঞতা জানায় পরম করুণাময়ের কাছে। কৃতজ্ঞতা বোধ করে সে, মন বারবার নতি স্বীকার করতে চায় সকলের কাছে।

এতক্ষণে বোধহয় মোতি ঘুমিয়েছে। নিঃশ্বাস পড়ে। নির্মল সুন্দর মুখে প্রশান্তি জেগে থাকে। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে খুদাবক্স তার কানে কানে বলে, মোতি, এবার আমি আর তুমি চলে যাব রিসালা হল্‌ট ছাড়িয়ে আমার গাঁয়ে। সেখানে তোমার জন্যে ক্ষেতে গিয়ে চাষ করব আমি, আর ঠিক দুপুর বেলা কালো কামিজ ওড়নী পরে রুপোর বালা হাতে তুমি মাথায় ক'রে খাবার বয়ে আনবে আমার জন্যে। সন্ধ্যে বেলা যখন ঘরে ফিরব, তখন চেরাগ জেবলে দিয়েছ, চুলা ধরিয়েছ কাঠকুঠো জেবলে। কিন্তু এখন নয়, পরে।

ঘুমের ঘোরে একটু সাড়া দিল মোতি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। তার পাশেই শুয়ে পড়ল খুদাবক্স। ভোরের হাওয়ায় ঘুম এল না চোখে, কান পেতে শুনতে লাগল ভোরের শানাই।

ষোল

প্রভাত হলে দু'জনেই পথে বেরুল। মোতির পরনে পাঠান রমণীর পোষাক, কোমরে তরবারি, পায়ে নাগরা। খুদাবক্স ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলল, তার পাশে পাশে চলল মোতি। পথচারী সবিস্ময়ে তাকাতে লাগল তাদের দিকে। বড় সুন্দর জোড়ী হয়েছে, একথাও তাদের চোখে চোখে ফুটল। ঈষৎ সলাজ হেসে মোতি স্বীকার করতে লাগল পরিচিত পথচারীদের। স্মিত হাসতে লাগল খুদাবক্স। বড় ভাল লাগছে তার। তাদের পাশাপাশি চলাটাও সকলের চোখে সপ্রশংস স্বীকৃতি পাক। তাতে তাদেরই ভাল হবে।

কেল্লাতে পৌঁছে প্রথমেই খুদাবক্স খোঁজ করল পরন্তপের। মোতিকে বলল, আগে তার সঙ্গে দেখা করো।

একরাতেই চেহারা বদলে গেছে পরন্তপের। স্নান করেছে, গোঁফ চুমরে তুলেছে কানের ওপর। মুরেঠা বেঁধেছে কায়দা করে। কুর্তা, চিপা যা পরেছে সবই নতুন। পেতলের ফুল বসানো একজোড়া নতুন নাগরাও জোগাড় করেছে ইতিমধ্যে। খুদাবক্স বলে, পরন্তপ, এ-ই মোতি।

মোতি মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন জানায়। ঝাঁকড়া ভুরুর নীচে বড় বড় চোখ দু'টোতে প্রশংসা ফোটে। পরন্তপ বিব্রত হচ্ছে জেনে মোতি বলে, রাতে আরাম করেছেন? কিছু মুস্কিল হয়নি?

—না বহিন্, কিছু মুস্কিল হয়নি। পরন্তপের বিব্রত অবস্থা সকৌতুকে দেখে খুদাবক্স। বলে, পরন্তপ, কথা বল কিছু।

পরন্তপও টক্কর নেয়। বলে, কথা ত' ওঁর সঙ্গেই বলব। সে আমরা সময় ক'রে নেব। সেখানে তুমি থাকবে না। বহিন্‌জী কি বলেন?

—বহুর চৌহানজী!...লজ্জাও পায় মোতি একটু, আবার ভালোও লাগে তার। পরন্তপ বলে, অংরেজ ফৌজ ত' এসে পড়েছে। আমরা দেখতে যাচ্ছি।

মান্দার, কাশী, জুহী, ঝলকারী, হীরা ও গঙ্গা একে একে এগিয়ে আসে। সকলেরই পাঠান যুবকের বেশ, কোমরে তরোয়াল, মান্দার ও কাশী দু'খানা ছোট পিস্তল বহন ক'রে। জুহীর চোখটা নাচতে থাকে। মোতিকে বলে, আমরাও একটু পরিচয় করতে চাই খাঁ সাহেবের সঙ্গে মোতি!

মোতি বলে, নিশ্চয়।...সম্মান ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে সহজ ভাবে মান্দার বলে, পরিচয় করিয়ে দিই আমি। আমি মান্দার, এ কাশী, ও ঝলকারী,...খুদাবক্স সম্মানের সঙ্গে তাদের স্বীকার করে। তারপর খুদাবক্স, পরন্তপ ও মোতি দক্ষিণ বুরুজের দিকে যায়। পরন্তপের চোখের দিকে খুদাবক্স তাকায়, মেয়েদের এই অকুণ্ঠ ব্যবহার ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে সে কি ভাবে নিয়েছে তা-ই দেখে। বিস্মিত সে নিজেও কম হয়নি। পরন্তপ মাথা নেড়ে জানায়,—হ্যাঁ ঠিক আছে। বলে, তাজ্জব কিন্তু বেশী তাজ্জব নয়। এই রকমই ত' হওয়া উচিত ছিল, অন্য কোথাও ত' হ'ল না।

বুরুজে দাঁড়িয়ে দূরবীণ চোখে দিয়ে দেখছেন ঘোস, রঘুনাথ সিং এবং লালা ভাও। খুদাবক্স ও পরন্তপও দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। জোকানবাগের অনেক পেছনে, ক্যাণ্টনমেণ্ট ও দগ্ধ ষ্টার ফোর্ট ছাড়িয়ে ইংরেজ সৈন্য আসছে। উঁচুনীচু জমিতে কখনো তাদের দেখা যাচ্ছে, কখনো দেখা যাচ্ছে না। দূরবীণ দিয়ে পরন্তপ ও খুদাবক্স দেখে। ঘোস বলেন, মাঝখানে যে প্রৌঢ় পুরুষকে দেখছ, তিনিই সার হিউ রোজ। তাঁর চোখেও দূরবীণ, খুব নজর করছেন কেল্লার দিকে। দেখতে চেষ্টা করছেন।

দূরবীণ নামিয়ে ঘোস বলেন,—ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে দাও!

টকটকে লাল রেশমের ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে বাঁধা হয়। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে সেই ঝাণ্ডা উড়তে থাকে নীল আকাশে। ঘোস বলেন, দেখতে হয় ত' ভাল ক'রে দেখুক।

—ফৌজ কত হবে ওস্তাদজী?

রানীর প্রশ্নে সচকিত হয় সকলে। প্রভাতে পূজা অন্তে, পাড়বিহীন লাল রেশমের শাড়ী মরাঠি পদ্ধতিতে পরেছেন রানী। সিল্ক কেশ কবরীবদ্ধ, কপালে চন্দন, কণ্ঠে মুক্তার

একাবলী, হাতে হীরার কঙ্কণ, পায়ে নাগরা। দূরবীণ নিয়ে নজর করেন। বলেন, কত হবে বলে মনে করেন?

ঘোস বলেন, রোজের সঙ্গে শুধু দুই নম্বর ব্রিগেড আছে। এক নম্বর ব্রিগেড আসছে চন্দেরী ঘুরে। ভূপালের বেগম শিকান্দারের সাতশো ধরলে পুরা ফৌজ নয় হাজারের কাছাকাছি যাবে।

—আমারও তাই আন্দাজ। কিন্তু জানেন ওস্তাদ, আমি যেমন ওদের খবর পাচ্ছি, ওরাও ত' আমাদের পুরা খবর পেয়ে গিয়েছে!

—এ আফ্‌শোষের কিনারা কোথায় সরকার! গোপালরাওকে'ত কয়েদে রাখব?

—হাঁ জরুর। ঠাকুরমর্দন সিং না আসা পর্যন্ত গোপালরাও-এর গোস্তাকি আর হারামির কিনারা মিলবে না।

—আর চন্দন সিং?

—তার কিনারা এখনই করব। লড়াই সামনে নিয়েও যে বেইমান এইরকম হারামী করতে পারে ফিরিঙ্গীর জন্যে, তার এক ফোঁটা খুন না রেখে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারেন ওস্তাদ? ভয় হয়, সেই খুন যেখানে পড়বে সেখানেই মাটি অবধি হয়ে যাবে বেইমান। ধরণীমাতার গা জ্বলে যাবে! কড়াকড়ি কমতে দিলে ত' হবে না!

ঘৃণা ও আবেগে রানীর মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বলেন, কত চেষ্টা ক'রে কত কষ্টে এই লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করেছি, কত সাচ্চা জান আমার সঙ্গে বে-পরোয়া হয়ে নেমেছে, বলুন ওস্তাদ সেই লড়াই যদি কেউ ভেঙে দিতে চায়, তাকে কি করা উচিত?

সবাই চুপ করে থাকে। ওদিকে ইংরেজের ফৌজ কেল্লার তিন মাইল দূরে থামে। ছাউনী বাঁধে। ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ অফিসাররা টহল দিয়ে কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করেন। প্রশংসনীয় তাঁদের নিয়ম ও শৃঙ্খলা।

প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে বেলা গড়িয়ে যায় ইংরেজের। তিনটের সময় থেকে ইংরেজের কামান গর্জন ক'রে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা থেকে জবাব দেয় ঘোসের কামান।

দক্ষিণবুরুজের ভার কারো ওপর ছাড়েন না ঘোস। 'ঘনগর্জ' বসিয়ে পাল্লা ঠিক ক'রে নিতেই যা দেরী হয়েছিল। তারপর বড় নৈপুণ্যে কামান চালান ঘোস। মোতি তাঁর পেছনে থাকে। বারুদ ও গোলা সরবরাহ ক'রে। স'ইয়ার দরওয়াজায় 'অর্জুন' কামানের সামনে রয়েছে খুদাবক্স। সহসা যেন তার মনের কথা ধরে ঘোস বলেন, ও খুব লড়ে এসেছে, ঠিক জান বাঁচিয়ে চলবে। লজ্জিত হয় মোতি। চোখটা পরন্তপের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে কাজ ক'রে যায়। ভীমগর্জনে ফেটে পড়ে ঘনগর্জ। আকাশে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায়।

স'ইয়ার দরওয়াজায় বসেছিল খুদাবক্স। কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল ইংরেজ ব্যাটারী বেঁধেছে স্যগর দরওয়াজার সামনে। ঘোসের হুকুমে মরাঠা মেয়ে সুন্দর ও পীরআলিকে স'ইয়ার দরওয়াজা ছেড়ে দিয়ে সাগর দরওয়াজায় চলে যায় খুদাবক্স।

সন্ধ্যার মুখে পথের ধারের বাতিদানে জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিয়ে যায় আসাবরদাররা। পুরোরাত লড়াই চলবে বলে বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় যখন লড়াইরত সৈনিক ও গোলন্দাজদের খাবার পেঁৗছে যাচ্ছে তখন খুদাবক্সের জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসে মোতি। খুদাবক্স হাসে। বলে, চুলগুল্লো কি করেছ?

—কি করেছি? খুব টান ক'রে তুলে বেণী বেঁধে, মুরেঠা পরেছে মোতি।

—গাঁয়ের মানুষের মত দেখাচ্ছে যে? জলের পাত্রটা কাছে আনে মোতি। পাশে বসে বলে, আমি ত' গাঁয়েরই মানুষ। তোমার মত শহরওয়ালা নই।

—কোন্ গাঁয়ের মানুষ?

—যে গাঁয়ের মালিক তুমি। দু'জনেই হাসে। ভাগ ক'রে খায় একসঙ্গে। কামানের লোহাটে গন্ধের সঙ্গে তেল ও বারুদের গন্ধ মিশে এক অদ্ভুত পরিবেশ রচনা করে।

ইংরেজ ব্যাটারীতে বাতি নেই। তাই নিশানা ঠিক করবার সুবিধে হয় না। তবু ঠিক জায়গাতে বসে থাকে খুদাবক্স। চোখদুটি দিয়ে দেখে আর নিশানা ঠিক করে। বারুদ আর পলতে থাকে হাতের কাছে। মোতিকে পরম অধিকারবোধে বারবার দেখে খুদাবক্স। বলে, সেই সকালের পর এই দেখলাম তোমাকে জান?

—হাঁ জী।

—কেমন লাগছে মোতি?

—ভাল। বলে মোতি উঠে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে কম্বল এনে খুদাবক্সের পায়ের কাছে রাখে। তারপর ঘোড়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন ছোকরা সিপাহীকে ডেকে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াতে দিয়ে দেয়।

একটি বালক সৈনিকের মতো বোধ হয় মোতিকে। দেখে দেখে খুদাবক্সের মনে হয়, এই প্রেমই সে কামনা করেছিল। যখন যুদ্ধক্ষেত্র বাসর হল, তখন প্রিয়াকে নির্ভয়ে কাছে পেল। কত সহজ, আর সুন্দর। আজ রাত্রি প্রভাত হলে—। কামানের ঠাণ্ডা গায়ে মাথা রাখল খুদাবক্স, আগামী কালের কথা আর ভাববে না সে। সে সময় চলে গেছে।

পাশে ব'সে মোতি বলল, সারাদিন পরন্তপ চৌহানের সঙ্গে অনেক কথা হল।

—আমাকে বলেছে পরন্তপ।

—কি বলেছে?

খুদাবক্সের ঠোঁটে কৌতুক ঝিলিক দিল। পরন্তপ বলেছে—এই মেয়ে তোমার পথ চেয়ে বসেছিল, আর তুমি এত বড় যুদ্ধ যে কয়বছর ধরে আমার গোঁফ ধরে বসে আছ? আহা-হা হা খুদাবক্স, বড় আফশোষ হচ্ছে, কি রকম ক'রে যে নাশ করেছি জওয়ানীর দিনগুলো! কি কথা, কি আদর! কি মেয়ে! তোমার আছে শুধু চেহারাখানা, আর গোঁয়ারের মত এক লক্ষ জেদ! কি দেখে যে মোতি...মুখে সে বলল, আমার সৌভাগ্যকে প্রশংসা করছিল। জানেনা ত' কি বাঘ্নী একজন!

—খুব যে বলছ!

—না, কিছু বলছি না।

দু'জনে বসে দেখে জাগ্রত নগরীর কর্মচাঞ্চল্য। খুদাবক্স বলে, কেউ কিছু বলেছে তোমাকে মোতি?

—আমি শুনিনি। তবে হ্যাঁ, জুহীরা ঠাট্টা করেছে একটু। ও কিছু নয়। তোমাকে কিছু বলেছে কেউ?

মনে পড়তেই হাসে খুদাবক্স। বাহ্রামের কাছে শুনেছে ঘোস খুব নাকি ফূর্তি করছেন আজ। হৈ-চৈ লাগিয়েছেন। মোতি যতক্ষণ না গিয়েছিল, ততক্ষণ পরন্তপের সঙ্গে খুব তামাসা করেছেন তাদের নিয়ে। মুখে বলে, না বলেছে তুমি আমাকে আদর যত্ন করোনি। আর জামাটা দেখিয়ে তামাসা করেছে।

মোতি লজ্জা পায়। বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব কথা থাক্।

দু'জনে বসে থাকে। রাত গভীর হয়। একটা বাজলে রঘুনাথ সিংহ রিসালদার আসেন দুলহাজুকে নিয়ে। খুদাবক্স ও মোতিকে ছুটি দিয়ে দেন। দুলহাজু বসে খুদাবক্সের জায়গায়। রঘুনাথ সিং বলেন, কাল সকালে জোর লড়াই লাগবে। প্রথম ব্রিগেড এসে পৌঁছবে ভোরে। আজ রাতে কোন আক্রমণ হবে না। ঘরে যাও, আরাম করো খুদাবক্স, কাল থেকে আর ছুটি পাবে না।

ঘরের দিকে রওনা হয় খুদাবক্স ও মোতি। ফটকে ফটকে মিস্ত্রী কাজ করছে, রমণীরা পুরুষের পোষাকে যে যার ঘরে চলেছে। বড় বড় বালির বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া। সেগুলি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে প্রাচীরের কোল দিয়ে। সহসা ঘোড়া থামায় মোতি। ইসারায় আসতে বলে খুদাবক্সকে। দেখে প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে আসছেন বাঈসাহেব। অন্যমনস্ক বোধ হয় তাঁকে। মোতিকে ও খুদাবক্সকে দেখে একটু অপ্রতিভ হাসি খেলে যায় তাঁর মুখে। বলেন,—খুদাবক্স খাঁ, আপনি শুনেছেন ত' আগামী কাল থেকে আসল লড়াই শুরু হবে।

—হাঁ সরকার।

—শুনলাম আপনি কানপুর, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ-এ লড়েছেন।

—জী।

—আমার সহরের কথা কি জানে লোকে?

—সূর্য উঠলে যেমন তার কিরণ প্রকাশ পায়, তেমনই আপনার নাম ছড়িয়ে গেছে সরকার।

খুদাবক্সের কণ্ঠের অকুণ্ঠ সত্যভাষণ রানীকে কৃতজ্ঞ ক'রে। ঘোড়ায় একটু লাগাম ঝাঁকিয়ে তিনি চলতে চলতে বলেন, বড় মহৎ এইসব সাধারণ মানুষ খাঁ সাহেব। আমার সুকৃতির চেয়ে তাদের মন অনেক বড়।

তারপর সহসা বলেন, অরছা দরওয়াজায় আমাদের এক বুড়ো নকীবের ছেলে মরে গেল মোতি গুলী লেগে। বড় দুঃখ লাগল বাপের কান্না দেখে। সামনে থাকতে পারলাম না। সন্ধেবেলা লেগেছিল চোট, মরল এখন। তাকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি মোতি...বালক বয়স থেকে!

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে খুদাবক্স বলল, এখনত আরো অনেক হবে এইরকম সরকার।

—নিশ্চয়। তবু যুদ্ধ বড় কঠিন, অনেক জান নিয়ে যায়। জান ফিরে দেয়াত চলে না।

চলে যান বাঈ সাহেব। নগরীর অন্যদিক দেখাশুনা করতে। ছায়ার মতো অনুসরণ ক'রে কিছু ভীমমূর্তি পাঠান এবং আফঘান সওয়ার, রানীর একান্ত অনুগত তারা।

ঘরে এসে মোতি পুরোনো ধাঁচের একখানা হাল্কা লাল চন্দেরী পরে। সবুজ রেশমের চোলী পরে সঙ্গে। বেণী ঝুলিয়ে দেয়।

চিপার ওপর লক্ষ্ণৌ-এর চিকণের কুর্তা পরে খুদাবক্স। মুরেঠা ফেলে দেয়। চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুণীটা ভেঙে যায়। মোতি হেসে ফেলে। বলে, কি ছেলেমানুষী করছ?

মোতি যতক্ষণ সর্মা পরে খুদাবক্স গালিচার ওপর পায়চারী ক'রে অধৈর্য হয়ে। বলে, কেন এত সাজছ মোতি, আমি ত' কবুল করেছি, আমি ঘায়েল হয়ে গিয়েছি।

অমনি অভিমান স্ফুরিত হয় অধরে নয়নে। মোতি বলে, কত যে কষ্ট দিয়েছ? মোতির সামনে নতজানু হয়ে বসে খুদাবক্স। বলে, শাস্তি দাও।

কি বলবে মোতি। সুখ ও আনন্দে ছলছল ক'রে চোখ। বলে, তোমাকে শাস্তি দেব, আর নিজে সেই জ্বালা বুকে নিয়ে জ্বলে জ্বলে যাব? আর নয় খুদাবক্স।

ক্লান্তিতে পিঠ টান ক'রে খুদাবক্স। সন্ত্রস্ত হয়ে মোতি উঠে দাঁড়ায়। বালিশটা টেনে দেয়। বাতি দেয় নিভিয়ে। শুয়ে পড়ে খুদাবক্স। পাশে বসে তার চুলে আঙুল বুলিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স হাত দু'খানা ধরে। বলে, তোমাকে সেই বাগানে কত কি বলেছিলাম, মনে পড়ে? সেই ছেড়ে যাবার সময়ে?

না, মোতির মনে পড়ে না। খুদাবক্স বলে, সেদিন যত কথা বলেছিলাম আমি, পরে ভেবে দেখেছি, তোমাকেই বলেছি। লেগেছিল, জ্বলে গিয়েছিল, তাই বলেছি। তুমি বলেই সব ক্ষমা করেছ মোতি।

—তোমার কোন আফশোষ নেই'ত খুদাবক্স?

—না। থাকলে তুমি শুনতে পেতে মোতি। খুদাবক্সের উষ্ণ বুকের শব্দ শুনতে পায় মোতি। বলে, দেখ খুদাবক্স, কত কে'দেছি এক সময়ে, কত দুঃখ করেছি। না খোদা মানতাম, না কোন বিশ্বাস ছিল। এমন করেই পেলাম তোমাকে, এখন সবই ভালো মনে হয়, সবই বিশ্বাস করি।

—বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে জীবন মোতি—

—বড় ভাল লাগছে বাঁচতে।

—এমন সময় আর কখনো মিলবে না মোতি—

—না খুদাবক্স।

—এমন রাতে ঘুমোবে?

—না।

—কষ্ট হবে না?

—দিনে'ত আরাম করেছি।

—আমিও। দেখি এদিকে তাকাও'ত মোতি।

মুখ তোলে মোতি। স্থির আর শান্ত তার মুখ। গভীর তার চোখ। খুদাবক্স বলে, আগেকার মন হলে কত কথা বলতাম মোতি, এখন কামান সামনে নিয়ে সে কথা কি মানাবে?

—হাঁ খুদাবক্স, কেন কি পরে'ত সময় না-ও মিলতে পারে। তুমি আর আমি এক-সঙ্গে'ত না-ও থাকতে পারি।

—না মোতি, আর কখনো তুমি আর আমি দূরে থাকতে পারবো না। তোমার মধ্যে আমি রইলাম, আমার মধ্যে তুমি রইলে।

—আরো বল খুদাবক্স।

—তুমি বল মোতি।

—তুম ভয়ে মোতি, ময়ঁ ভয়ে ধাগা
তুম ভয়ে সোনা, হম ভয়ে সুহগা—
পিয়া মৈঁ নহীঁ তোড়ূঁ
তোরী প্রীত তোড়ী কিণ সংগ জোড়ূঁ॥

—নিজের কথায় বল মোতি—

—আমার সব কথা তুমি জান খুদাবক্স, কি বলব।

—কিছু বোল না মোতি, এখানে থাক চুপ ক'রে, আমার কাছে।

আঁধার ঘর। অনিশ্চিত আগামী কাল। তবু প্রেম মুখর হয়ে ওঠে। অশ্রুত রাগরাগিণী বেজে ওঠে, প্রিয়াকে বুকের কাছে ধরে রাখে খুদাবক্স। অনত মুখ তুলে সস্নেহে আদর করে চোখে, মুখে, কপালে। ঝঞ্ঝার মত বাতাস বয়ে আনে ধূলোর গন্ধ। খুদাবক্স বলে, পাগলা রাত!

হয় ত' তাই-ই। তবু বড় মধুর আর সুন্দর। মোতি বালিশে হেলান দেয়। খুদাবক্স বলে, একি অপমান মোতি? এমন একখানা বুক পেতে দিয়েছি, চওড়া বাহু দিয়েছি বিছিয়ে, তাতেও হল না?

মোতিকে বাহুবন্ধনে কাছে টানে খুদাবক্স। বলে, দূরে থেকো না মোতি। তুমি'ত জানো না এ আমাদের বিয়ের রাত।

—কবে হ'ল?

—অনেকদিন আগে। সে তোমার মনে নেই। তুমি তখন খুব ছোট। নাকে নথ পরতে, আর মল বাজিয়ে ছুটে পালাতে আমাকে দেখে।

—সত্যি খুদাবক্স, কতগুলো দিন হারিয়ে গেছে বল'ত? এমন সময় খুঁজলে তুমি, যে সময় মিলল আধরী সময়ে।

—বারে! ভাল সময় না হলে কি হয় মোতি? ঠিকানা'ত তুমিও জানতে, এলে না কেন আমার রিসালা হল্‌টে? কত রাতে তোমার পায়ের মলের বাজনা শুনেছি মোতি, তোমার কথা পেয়েছি বাতাসে।

খুদাবক্সের গলায় কোন অভিযোগ নেই। মোতি মুখ লুকিয়ে বলে, মল পরব খুদাবক্স, এইদিন কেটে যেতে দাও, যেমন ক'রে রাখবে তুমি, তেমনি থাকব, যা পরতে বলবে, তাই পরব। শুধু আমি কি করেছি সে কথা বোল না। আমি সহ্য করতে পারি না।

খুদাবক্সও সে কথা বলে না। মোতিকে বুকের কাছে রেখে তার হৃৎস্পন্দন শোনে আর অবাক মানে। এত পূর্ণ তার প্রেম, তবু এই বুভুক্ষা? কোন্ পূর্ণতা চায় সে? কোন্ স্বর্গ কামনা ক'রে? তার রক্তকণিকা আহ্বান ক'রে মোতিকে। মোতির উষ্ণ ও কোমল দেহ, চঞ্চল ক'রে খুদাবক্সকে। ক্ষুধিত, ও পিপাসিত প্রেম জাগে।

মদির হয়েছে মোতির সুরভিত কেশ, গ্রীবা, কপোল, অধর। আত্মসমর্পণের বাসনায় আকুল হয়েছে তার দেহ। প্রিয়তমের বক্ষে লীন হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে মোতি, শত শত পাঁপড়িতে ফুটে উঠতে চায়।

খুদাবক্স বড় সম্মান দেয় তার প্রেমকে। বড় মর্যাদায় গ্রহণ ক'রে তাকে।

সপ্রেমে চেয়ে থাকে মোতি। অতল রহস্যের সরোবর যেন তার কালো চোখ। মন বলে, আমার দেহ আজ দেহ বলে মানলাম, গৃহ হল ধন্য। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে বুকে রেখে তৃপ্তি নেই জন্ম জন্ম ধরে দেখে আঁখির পিপাসা মেটে না, একি অবাধ্য, অনায়ত্ত, পিপাসিত প্রেম?

খুদাবক্স অল্প হাসে। তার হাতখানা নিজের কপালে রাখে। তার নয়নই জানায় যে ধন্য হয়েছে সে।

অমনি অভিমান স্ফুরিত হয় অধরে নয়নে। মোতি বলে, কত যে কষ্ট দিয়েছ? মোতির সামনে নতজানু হয়ে বসে খুদাবক্স। বলে, শাস্তি দাও।

কি বলবে মোতি। সুখ ও আনন্দে ছলছল ক'রে চোখ। বলে, তোমাকে শাস্তি দেব, আর নিজে সেই জ্বালা বুকে নিয়ে জ্বলে জ্বলে যাব? আর নয় খুদাবক্স।

ক্লান্তিতে পিঠ টান ক'রে খুদাবক্স। সন্ত্রস্ত হয়ে মোতি উঠে দাঁড়ায়। বালিশটা টেনে দেয়। বাতি দেয় নিভিয়ে। শুয়ে পড়ে খুদাবক্স। পাশে বসে তার চুলে আঙুল বুলিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স হাত দু'খানা ধরে। বলে, তোমাকে সেই বাগানে কত কি বলেছিলাম, মনে পড়ে? সেই ছেড়ে যাবার সময়ে?

না, মোতির মনে পড়ে না। খুদাবক্স বলে, সেদিন যত কথা বলেছিলাম আমি, পরে ভেবে দেখেছি, তোমাকেই বলেছি। লেগেছিল, জ্বলে গিয়েছিল, তাই বলেছি। তুমি বলেই সব ক্ষমা করেছ মোতি।

—তোমার কোন আফশোষ নেই'ত খুদাবক্স?

—না। থাকলে তুমি শুনতে পেতে মোতি। খুদাবক্সের উষ্ণ বুকের শব্দ শুনতে পায় মোতি। বলে, দেখ খুদাবক্স, কত কে'দেছি এক সময়ে, কত দুঃখ করেছি। না খোদা মানতাম, না কোন বিশ্বাস ছিল। এমন করেই পেলাম তোমাকে, এখন সবই ভালো মনে হয়, সবই বিশ্বাস করি।

—বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে জীবন মোতি—

—বড় ভাল লাগছে বাঁচতে।

—এমন সময় আর কখনো মিলবে না মোতি—

—না খুদাবক্স।

—এমন রাতে ঘুমোবে?

—না।

—কষ্ট হবে না?

—দিনে'ত আরাম করেছি।

—আমিও। দেখি এদিকে তাকাও'ত মোতি।

মুখ তোলে মোতি। স্থির আর শান্ত তার মুখ। গভীর তার চোখ। খুদাবক্স বলে, আগেকার মন হলে কত কথা বলতাম মোতি, এখন কামান সামনে নিয়ে সে কথা কি মানাবে?

—হাঁ খুদাবক্স, কেন কি পরে'ত সময় না-ও মিলতে পারে। তুমি আর আমি এক-সঙ্গে'ত না-ও থাকতে পারি।

—না মোতি, আর কখনো তুমি আর আমি দূরে থাকতে পারবো না। তোমার মধ্যে আমি রইলাম, আমার মধ্যে তুমি রইলে।

—আরো বল খুদাবক্স।

—তুমি বল মোতি।

—তুম ভয়ে মোতি, ময়ঁ ভয়ে ধাগা
তুম ভয়ে সোনা, হম ভয়ে সুহগা—
পিয়া মৈঁ নহীঁ তোড়ু
তোরী প্রীত তোড়ী কিণ সংগ জোড়ু॥

—নিজের কথায় বল মোতি—

—আমার সব কথা তুমি জান খুদাবক্স, কি বলব।

—কিছু বোল না মোতি, এখানে থাক চুপ ক'রে, আমার কাছে।

আঁধার ঘর। অনিশ্চিত আগামী কাল। তবু প্রেম মুখর হয়ে ওঠে। অশ্রুত রাগরাগিণী বেজে ওঠে, প্রিয়াকে বুকের কাছে ধরে রাখে খুদাবক্স। আনত মুখ তুলে সস্নেহে আদর করে চোখে, মুখে, কপালে। ঝঞ্ঝার মত বাতাস বয়ে আনে ধুলোর গন্ধ। খুদাবক্স বলে, পাগলা রাত!

হয় ত' তাই-ই। তবু বড় মধুর আর সুন্দর। মোতি বালিশে হেলান দেয়। খুদাবক্স বলে, একি অপমান মোতি? এমন একখানা বুক পেতে দিয়েছি, চওড়া বাহু দিয়েছি বিছিয়ে, তাতেও হল না?

মোতিকে বাহুবন্ধনে কাছে টানে খুদাবক্স। বলে, দূরে থেকো না মোতি। তুমি'ত জানো না এ আমাদের বিয়ের রাত।

—কবে হ'ল?

—অনেকদিন আগে। সে তোমার মনে নেই। তুমি তখন খুব ছোট। নাকে নথ পরতে, আর মল বাজিয়ে ছুটে পালাতে আমাকে দেখে।

—সত্যি খুদাবক্স, কতগুলো দিন হারিয়ে গেছে বল'ত? এমন সময় খুঁজলে তুমি, যে সময় মিলল আধরী সময়ে।

—বারে! ভাল সময় না হলে কি হয় মোতি? ঠিকানা'ত তুমিও জানতে, এলে না কেন আমার রিসালা হল্‌টে? কত রাতে তোমার পায়ের মলের বাজনা শুনেছি মোতি, তোমার কথা পেয়েছি বাতাসে।

খুদাবক্সের গলায় কোন অভিযোগ নেই। মোতি মুখ লুকিয়ে বলে, মল পরব খুদাবক্স, এইদিন কেটে যেতে দাও, যেমন ক'রে রাখবে তুমি, তেমনি থাকব, যা পরতে বলবে, তাই পরব। শুধু আমি কি করেছি সে কথা বোল না। আমি সহ্য করতে পারি না।

খুদাবক্সও সে কথা বলে না। মোতিকে বুকের কাছে রেখে তার হৃৎস্পন্দন শোনে আর অবাক মানে। এত পূর্ণ তার প্রেম, তবু এই বুভুক্ষা? কোন্ পূর্ণতা চায় সে? কোন্ স্বর্গ কামনা ক'রে? তার রক্তকণিকা আহ্বান ক'রে মোতিকে। মোতির উষ্ণ ও কোমল দেহ, চঞ্চল ক'রে খুদাবক্সকে। ক্ষুধিত, ও পিপাসিত প্রেম জাগে।

মদির হয়েছে মোতির সুরভিত কেশ, গ্রীবা, কপোল, অধর। আত্মসমর্পণের বাসনায় আকুল হয়েছে তার দেহ। প্রিয়তমের বক্ষে লীন হয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে মোতি, শত শত পাঁপড়িতে ফুটে উঠতে চায়।

খুদাবক্স বড় সম্মান দেয় তার প্রেমকে। বড় মর্যাদায় গ্রহণ ক'রে তাকে।

সপ্রেমে চেয়ে থাকে মোতি। অতল রহস্যের সরোবর যেন তার কালো চোখ। মন বলে, আমার দেহ আজ দেহ বলে মানলাম, গৃহ হল ধন্য। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে বুকে রেখে তৃপ্তি নেই জন্ম জন্ম ধরে দেখে আঁখির পিপাসা মেটে না, একি অবাধ্য, অনায়ত্ত, পিপাসিত প্রেম?

খুদাবক্স অল্প হাসে। তার হাতখানা নিজের কপালে রাখে। তার নয়নই জানায় যে ধন্য হয়েছে সে।

যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে কোন সঙ্গীত রচনা হয়। এ যদি কথা ত' ও সুরে। এ আলাপ ত' ও বিস্তার।

শেষ প্রহর উত্তীর্ণ হলে উঠে পড়ে মোতি। খুদাবক্সকে স্নানের সাহায্য ক'রে। পায়ে পরায় নাগরা। কোমরে কোমরবন্ধ বেঁধে দেয়।

ইংরেজ শিবির থেকে বিউগ্‌ল শোনা যায়। ঘোড়া দুটোকে ঘাস দেয় খুদাবক্স। অধৈর্য হয়ে ডাকে মোতিকে।

—আই জনাব! বলে হাসতে হাসতে নেমে আসে মোতি। বলে, বাদশাহী মেজাজ হয়েছে দেখছি।

—আর কি দেখছ?

—দেখছি বাহার দেবার সখ। বলে লাফিয়ে ঘোড়ায় ওঠে মোতি। রাস্তায় বেরিয়ে নিজের নিশানায় চলে যায়। হাত নেড়ে হাসিমুখে বিদায় জানায়।

প্রত্যুষ তখনো কাটেনি, সাগর দরওয়াজায় গিয়ে বসে খুদাবক্স। চৌখুপি দিয়ে দেখে, তার দরওয়াজার সামনেই অনতিদূরে সুউচ্চ ইংরেজ ব্যাটারী। যতদূর চোখে পড়ে, ব্যাটারী আর মোর্চা। কাতারে কাতারে সুসজ্জিতবেশিত ইংরেজ ফৌজ।

কামানের পাল্লা ঠিক ক'রে খুদাবক্স। সারি সারি সৈন্য প্রাচীরের চৌখুপিগুলোতে বন্দুক সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামান্য আলো ফুটতে না ফুটতেই কেল্লা থেকে ঘোঁসের হাতে গর্জন ক'রে ঘনগর্জ। সঙ্কেত মেনে খুদাবক্স পলতেতে অগ্নি সংযোগ ক'রে। গর্জন ক'রে ওঠে নলদার। ইংরেজ ব্যাটারীকে গোলার আঘাতে আঘাতে এমন বিপর্যস্ত ক'রে খুদাবক্স যে সন্ধ্যা নাগাদ থেমে যায় ব্যাটারী। গোলার টুকরো লেগে খুদাবক্সের বাঁ হাত একটু জখম হয়। চৌকি ছেড়ে উঠে আসে। বাহ্‌রাম হাতখানা বেঁধে দেয়। শত্রু-পক্ষের কামান গর্জন ক'রে ওঠে অতর্কিতে। দ্রুত ছুটে নিজের চৌকিতে চলে যায় খুদাবক্স। আগুনের মত লাল গোলা এসে পড়ে সহরে। আগুন জ্বলে যায়। ঘোড়ার ক্ষুষা ও আহত নরনারীর আর্তনাদ শোনা যায়। তার চৌকিতে কামানের কাছে কেউ নেই। সহকারী পাশে পড়ে আছে।

চৌকিতে বসে নিশানা ঠিক ক'রে খুদাবক্স। বাহ্‌রাম হাতে হাতে গোলা ও বারুদ তুলে দেয়। সাগর দরওয়াজার কামানের হিম্মৎ দেখে লছমী ও সাঁইয়ার দরওয়াজার সাময়িক বিভ্রান্তি কেটে যায়। কেল্লা থেকে ঘনগর্জ, গরনালা ও কড়কবিজলীর ভীমগর্জনে আকাশ কাঁপতে থাকে। স্থির লক্ষ্য হয়ে খুদাবক্স মশাল জ্বালিয়ে অগ্নি সংযোগ ক'রে। ইংরেজ পক্ষের কামানের হাল্কা গোলা শূন্যে উড়ে এসে পড়ে। আগুন জ্বলে ওঠে। সাগর দরওয়াজার সামনের ইংরেজ ব্যাটারী ক্রমে নিরুত্তর হয়ে আসে।

এই সুযোগ। খুদাবক্স হিংস্র একাগ্রতায় গোলা ছুঁড়তে থাকে একটার পর একটা। ওদিকে কেল্লা থেকে এল উল্লাসের চিৎকার। ঘোঁসের গোলার আঘাতে শঙ্কর মন্দিরের ব্যাটারী ভেঙে গেছে। এবার পিছু হটতে লাগল ইংরেজ ফৌজ।

তপ্ত কামান। ধোঁয়া বের হচ্ছে মুখ দিয়ে। সে রাতে নিজের চৌকি ত্যাগ করল না কেউ। চারিপাশে তাকিয়ে নিজেদের অসুবিধা বুঝতে পারল খুদাবক্স। ইংরেজরা বাইরে, তারা ভেতরে। ঘনবসতি সহর। ওদের গোলাতে এ পক্ষে আগুন লাগছে যত, মানুষও মরছে তত। ঘাসে আগুন লাগলেই মুস্কিল। তা' ছাড়া জলের প্রশ্ন আছে। আর

অভাব দেখছে সে সুনিপুণ গোলন্দাজের।

রাত বারোটা বাজলে চৌকিতে চৌকিতে খাবার পৌঁছতে লাগল। তার চৌকিতে এল মোতি। বলল, আজ রাতে তুমি স'ইয়ার দরওয়াজায় চলে যাবে খুদাবক্স, সেখানে নতুন ব্যাটারী পড়েছে। এখুনি শুনে এলাম।

চৌখুপীর মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে কামানের নল। কামান বসাবার চৌকিটাতে উঠবার কয়ধাপ সিঁড়ি। সেখানে পাশাপাশি বসে মোতি আর খুদাবক্স। খুদাবক্স বলে, আজ কোথায় ছিলে মোতি?

—কেন? আমি'ত বরাবরই দক্ষিণবুরুজে থাকি। ওস্তাদের কাছে।

—কিরকম লাগছে মোতি?

—ভাল।

—আজ রাতেও কি কেল্লায় যাবে?

—না, আমি'ত সকাল থেকেই ছিলাম, এখন ছুটি নিয়ে এলাম। বাহ্‌রাম ভাই কোথায় গেল? কেল্লায়?

—তাই হবে।

—বড় ভালো লাগে মোতি তোমার মুখে ভাই শুনতে।

—আমার ভাইয়ের মতই কাজ করেছে বাহ্‌রাম, তুমি চলে যাবার কয়দিন পর থেকেই। বড় ভালো ছেলে। আর, সকলেই'ত ভাই আর বহিন হ'য়ে গেছে, দেখেছ'ত?

—হাঁ মোতি। বড় চমৎকার পরিবেশ। সবাই একই ধেয়ানে ব্যস্ত, একই জমিতে লড়ছে, বড় সুন্দর এই ভাব।

—কোন আফশোষ আর রইল না খুদাবক্স।

—না মোতি। যখন ভাবি, কোথায় কোন্ কিষাণ ঘরের ছেলে ছিলাম, কি জীবন কেটে যেত বল। আমার জীবন আর জওয়ানী থাকতে থাকতেই কত পেলাম দেখ। দেশকাল হয়ে গেল অন্য রকম। লড়বার সুযোগ পেলাম, বাপের কাছে কথা দিয়েছিলাম বদলা নেব, সে সুযোগও এমন ক'রে মিলে গেল, এই লড়াইটাই আমার কাছে সেই বদলা হয়ে গেল। কত দেশ দেখলাম, কত মানুষকে জানলাম, আবার দেখ, সবচেয়ে বড় ক'রে পেলাম তোমাকে। জীবন আমাকে অনেক দিল মোতি। এক জীবনে কি এত কেউ পায়? যদি এই দিন কাটাতে পার মোতি, তবে খুব কৃতজ্ঞ থাকবে।

মুখে কিছু বলে না মোতি। মনে মনে বলে—আমার নতি স্বীকার আর কৃতজ্ঞতা সবই তোমার কাছে। এক জীবনে আর অন্য কোন চরণে নত হব বল। জীবনের কাছে! সে একশোবার কিন্তু আমার দুই চোখে যে তোমাকে ছাড়িয়ে আর কিছু চোখে পড়ে না খুদাবক্স।

একবার চুরি ক'রে দেখে নেয় মোতি। অন্যদিকে চেয়ে আছে খুদাবক্স। চওড়া কাঁধ, গৌরবর্ণের ওপর একটা রোদে পোড়া তামাটে ভাব, লোহার জালের ওপর পাতলা কাপড়ের মুরেঠা বাঁধা, কপালে ঈষৎ ঘাম, পাতলা দাড়ি হয়েছে দুইদিন অবহেলার ফলে। নীল কুর্তা, তার ওপর তার হাতের কাজকরা বান্দি। হাতে, গলায়, মুখে, যথেষ্ট তেল, কালি, ও ময়লা লেগেছে। খুদাবক্সের চোখ আর ভুরু খুব সুন্দর, আর কি চমৎকার মুখ—সহসা খুদাবক্স বলে, হ্যাঁ, আমার বাবা খুব সুন্দর ছিল।

খুব লজ্জা পায় মোতি। তার দু'খানা হাতই ধরে ফেলে খুদাবক্স। বলে, এবার

লজ্জায় কোথায় মুখ লুকোবে মোতি?

বিব্রত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় মোতি। লজ্জিত হেসে বলে, খুব লোক ত' তুমি?

—আর তুমিও'ত খুব নিলাজ মোতি।

—তা' বলতে পার। বলে একটু গম্ভীর হয় মোতি। বলে, তা' বলতে পার খুদাবক্স। কিন্তু এই সময় কি লজ্জা আর ভয় করবার? কি জন্যে আমি লজ্জা করব খুদাবক্স, আমি'ত কোন অন্যায় করিনি। লোকলজ্জা আর ভয় করেছিলাম একবার। তাতে তোমাকেই ছাড়তে হল। লোকলজ্জা আর সম্মান দিয়ে আমি কি করব বল। এখানে? সবাই জেনেছে আমার কথা। অন্য কেউ কিছু মনে করে না খুদাবক্স, কি সময় দেখ, বাতাসে বারুদের গন্ধ, ঘরে ঘরে হাহাকার, আর আমাদের এই লড়াই!

আবেগে নয় ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে মোতি। তার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় খুদাবক্স। বলে, বাঙালী ডাক্তার গাঙ্গুলীবাবুর কথা তোমাকে বলেছি মোতি?

—পরিচয়ের কথা বলেছ।

—ডাক্তারবাবুকে শেষ আমি দেখলাম আগ্রাতে। তাঁর রেজিমেণ্টের খবর নেই, কিছু আহত ফৌজ ফেলে রেখে তারা পালিয়েছে। সহরের বাঘী পল্টন, বাঙালীদের ওপর ক্ষেপে গেছে। ডাক্তারবাবু রেজিমেণ্টের লোক, তবু তিনি তাঁর হাসপাতাল ছেড়ে এলেন না। বললেন, আমি ডাক্তার আমার কাজ রোগীর সেবা করা, দুই পক্ষের রোগীদের নিয়েই তিনি হাসপাতাল করলেন, প্রাণের পরোয়া করলেন না। বড় শ্রদ্ধা হয় তাঁর কথা ভাবলে। শেষ পর্যন্ত তাঁর পুরোনো রেজিমেণ্টের ছোট সাহেবই মারল তাঁকে বিশ্বাঘাতক বলে। কম কথা বলতেন, খুব হিম্মৎ রাখতেন, আর মন ছিল উঁচু। এরকম মানুষ আমি খুব বেশী দেখিনি মোতি। খুব সাচ্চা ইস্পাত ছিল তাঁর মধ্যে।

—বড় ভাল লাগে খুদাবক্স ভালো মানুষের কথা শুনলে। মনটা ভালো লাগে।

—আর কি ভালো লাগে মোতি?

জবাব দিতে গিয়ে মোতির গলার স্বর নীচু হয়ে যায়। বলে, আর ভালো লাগে প্রত্যেকটা মুহূর্ত জেগে থাকতে। ঘুমিয়ে পড়তে মন চায় না, পাছে হিসেব হারিয়ে ফেলি কোনো মুহূর্তের।

খুদাবক্স তার কাঁধে হাত রাখে। বলে, তুমি যখন ঘুমিয়েছ মোতি, তখনকার হিসেব জেন আমার কাছে পাবে। আমি কিন্তু একটা মুহূর্তও হারাইনি। গত কয় বছরের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর তা'হলে দেখবে সবগুলো মুহূর্ত ধরা আছে আমার মনে। দেহ ঘুমিয়েছে ত' মন ঘুমোয়নি। ধ্যানে তোমার কথা ধরে রেখেছি আর কতবারে কত সজ্জায় যে সাজিয়েছি মুখখানা। কখনো ঐ নাকে হীরের ফুল বসিয়ে দেখেছি, কখনো পরিয়েছি কালো জামাকাপড়, রুপোর গহনা পরে তোমাকে জল আনতে দেখেছি আমার ঘরের পেছনের চুণারকি নদীতে। একদিন এক বিয়ের যাত্রা দেখে মনে হয়েছিল, হলুদকাপড় পরে কোনদিন পালকীতে বসে যদি আমার ঘর চিনে চিনে এসো, তা'হলে বেশ হয়।

মোতি প্রিয়তমের মুখের দিকে সপ্রেমে চায়। বলে, তুমি'ত আমার মহারাজ, আমাকে যেমন রাখবে আমি তেমনি থাকব।

—আর তুমি কি মোতি?

—তুমি যা বলবে তাই খুদাবক্স।

খুদাবক্স হাসে। বলে, মনে হয় কি তামাম দুনিয়াকে জানান্ দিয়ে দেই মোতি।

নকীব দিয়ে পুকার লাগিয়ে দিই কি আমার সৌভাগ্যের কথা জেনে যাক সবাই।

—তুমি পাগল।

—হাঁ জী হাঁ, সবাই জানুক পাগল খুদাবক্স আর তাকে পাগল করেছে মোতি। তখন তোমাকেই দোষ দেবে সবাই।

—বলবে আমি নাচওয়ালী, তাই'ত? মোতির কথায় কিন্তু সেই পুরানো দিনের ঘটনার প্রতি কোন কটাক্ষ থাকে না। খুদাবক্স বলে, হাঁ মোতি। তুমি যদি নাচওয়ালী হও তোমার নাট আমি, তোমার পায়ের আওয়াজও আমার বুকে বাজবে, আর তোমার কদরবান দর্শকও আমি। আমার চোখে তোমার তারিফ থাকবে। জীবন দিয়ে নামওয়ারী ক'রে যাব মোতি, আর কারো তারিফের অপেক্ষা রাখব না।

মোতির সুখ পলকে থরথর ক'রে কাঁপিয়ে তোলে নিশীথকে। রাত কথা কয়ে ওঠে তারার ভাষায়। মোতি বলে, কিছু চাইব না খুদাবক্স, শুধু চাইব যে তোমার ধ্যান ধরে যেন দুনিয়া দেখতে দেখতে তোমার ধ্যানেই চলে যেতে পারি। বল আর কি চায় মানুষ?

—আমি ত' আর কিছু চাই না মোতি। যা মিলল, তা' পিয়াসা ভরিয়ে দিল, তবু পিয়াসা রয়ে গেল, তাই আরো মিলবার সম্ভাবনাও রয়ে গেল। মনে মনে মালা গেঁথে তোমার গলায় পরালাম, আর সেই মালা দেখ জানি না কখন আমারি গলায় দুলছে। তাই ভাবি তবে কেন এই কথা ভেবে মরব।

বাঁণা হয়ে কথাগুলো বুকে ধরে মোতি। রাত কেটে যায় সেই আসরে বাসর জাগিয়ে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক'রে সংগ্রামের আর একদিন সুরু হল। ভোরের মুখে চৌকিতে চৌকিতে দেখে সজাগ ক'রে দিয়ে চলে যান রিসালাদার সর্দাররা। উঠে দাঁড়ায় মোতি। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। স্মিত হাসিতে বিদায় জানায়। খুদাবক্স বলে, লড়াই চৌথা দিনে পড়ল।

—জী হাঁ।

—উম্মীদ করি যে সন্ধ্যায় দেখা হবে। আর যদি কোন বেওকুফ্ ফিরিঙ্গীর অবাধ্য গোলা এসে স'ইয়ার দরওয়াজায় পড়ে, চাই ওস্তাদের পাহারা কাটিয়ে তোমাকেই নিয়ে নেয়, তবে কি করবে মোতি?

—খুশী মনে চলে যাব।

—তাই এস, বিদায় জানাই মোতি, যে সময় হলে যেন কোন আফ্‌শোষ না জানাই।

—খুদা হাফিজ, যখন মিলব খুসীর সঙ্গে মিলব।

—খুদা হাফিজ—

বালক সেনানীর মত আরবী ঘোড়ার পিঠে চলে যায় মোতি। যেতে যেতে মাথা ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে একবার হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে যায়। জবাব দেয় খুদাবক্স। তারপর পথ ধরে স'ইয়ার দরওয়াজার। ততক্ষণে কেল্লা থেকে ঘনগর্জ-এর গম্ভীর নিনাদ আসছে। গরনালার গোলা তাঁর শীৎকারে গিয়ে পড়ছে ইংরেজ ব্যাটারীতে। বিপক্ষের মর্টার ও হাউইইজারের গর্জনও আসছে।

সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত। প্রতিরোধ সংগ্রাম অষ্টম দিবস উত্তীর্ণ হয়ে নবম দিবসে এল। মনে হয় যুদ্ধ এবার তার চক্র আবর্তন শেষ করবে।

শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। হতাহতের সংখ্যাও প্রচুর। এখন যেন বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের ফল কি হবে না হবে।

সুমহান প্রতিরোধ সংগ্রামের ভাগ্য পশ্চিম দিগন্তেই হেলে পড়ে। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, নরনারীর অপূর্ব আত্মত্যাগ, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে প্রাণপণ সংগ্রাম, সব ব্যর্থ হতে চলেছে। বিদেশী প্রতিপক্ষের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে প্রতিনিয়ত। নগরের পাষাণ প্রাকারে ফাটল ধরেছে। ঘনবসতি বাড়ীগুলি জ্বলে যাচ্ছে। সহস্রাধিক নরনারী নিহত।

আসন্ন পরাজয়ের প্রায়ান্ধকার পটভূমিকায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে সংগ্রামী নরনারী। মৃত্যু দ্বারে অপেক্ষমান। জীবনের তুচ্ছ প্রশ্নগুলি বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাই হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলিই জেগে থাকে। জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি নিবিড় বন্ধন অনুভব করে। গভীর সখ্যও নিয়ে সম্ভাষণ করে প্রভাতে। সন্ধ্যাবেলাও যে সকলকেই দেখতে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানকেই আঁকড়ে ধরে সবাই প্রতি মুহূর্তে বাঁচবার চেষ্টা করে। একনগরীতে একসঙ্গে এতদিন কাটিয়েছে তারা, তবু যেন বাঁচার মতো ক'রে বাঁচা হয়নি। আজকে তাই ক্ষমা, প্রীতি, প্রেম ও সহানুভূতি নিয়ে একে অপরকে দেখে।

সময় বুঝে গরম পড়েছে, ভরা ফাল্গুনের ডালায় বসন্ত সাজিয়েছে তার সওগাত। যুদ্ধ, মৃত্যু ও হত্যার পরোয়া না করেই প্রাণবন্যার শত স্বাক্ষর বহন ক'রে ফুটে উঠেছে পলাশ। শান্তির সময় হলে এমন দিনেই হোলির উৎসব হত। আবীরে কুঙ্কুমে আঙিয়া রঙিয়ে হোলি খেলত নরনারী। আজ হোলি খেলতে নেমেছে মৃত্যু। লালে লাল ক'রে দিয়েছে দিনগুলো, তবু সে হোলি খেলার বিরাম নেই। এ উৎসবের নহবৎখানায় আজ ললিতবসন্ত বাজছে না। অশ্রুত কোন নাটে বিসর্জনের বিদায়ী সঙ্গীতের সুর পুকার দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। আবাহন হতে না হতেই বিসর্জনের সময় হয়ে গেল এবারকার মতো। আজ সংগ্রামের নবম দিবস। মনে হচ্ছে এ যেন তিথি নবমী। এবারকার মতো বাতি নিভিয়ে আসর ভাঙার খেলাই খেলতে হবে। জমজমা ক'রে উৎসব আর জমবে না। নাট বন্ধ করবার এত্তেলা যেন পৌঁছে গিয়েছে।

প্রভাত হল। সূর্য উঠল পূর্বগগন প্রতিভাত ক'রে। অবরুদ্ধ নগরীর বুকে ধ্বংসের ছবিখানাই ফুটে উঠল সূর্য কিরণ সম্পাতে। ইঁট, কাঠ ও পাথরের ভস্মস্তূপের পাশে মৃত দেহের স্তূপ, ক্ষত বিক্ষত আহত নরনারীর আর্তনাদ, ভয়ঙ্কর নীরবতার মাঝখানে সৈনিকদের স্ব-কর্তব্য অবিচল থাকবার প্রস্তুতি শুধু চোখে পড়ে। গোলাবারুদের ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছে। পানীয় জলের সঞ্চয়ও শুষ্কপ্রায়। নগরীর আকাশে চক্রাকারে পাক দিচ্ছে গৃধিনী শকুনী। বিপক্ষের কামান আজ একেবারে নীরব। নগরীর দুর্বল অবস্থা তারা জেনেছে। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই নগরী ও তার প্রত্যেকটি নরনারীর ওপরে মৃত্যুর পরওয়ানা জারী হয়েছে। শুধু প্রবেশ করবার অপেক্ষা।

আশা নিরাশার অতীত কোন পাথুরে সঙ্কল্পে বুক বাঁধল সংগ্রামী নগর। প্রত্যূষ থেকেই যে যার চৌকি গ্রহণ করতে ব্যস্ত হল। স্নান করল প্রত্যেকে, মন্দির ও মসজিদে বাঁরহৃদয়ের প্রণতি পাঠাল, তারপর স্ব স্ব স্থানে আসন গ্রহণ করল। বিপক্ষ তেমনই নীরব।

প্রভাতে স্নানান্তে নতুন পোশাক পরে চৌকিতে এলেন ঘোস। মোতিকে বললেন, ঘরে যাও বেটি, খুদাবক্সকেও ডেকে নিয়ে যাও। তৈরী হয়ে এসো।

স'ইয়ার দরওয়াজায় কামান সামনে নিয়ে বসেছিল খুদাবক্স। জবাহির সিংকে চৌকি ছেড়ে দিয়ে নেমে এল।

পরাজয়ের সম্ভাবনাতে থম্‌থমে আবহাওয়া। শ্মশানের মত নীরব। সৈনিকরা কম্বলে

জড়ানো মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের চোখেও আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট।

বাড়ীতে পৌঁছে খুদাবক্স অন্যমনস্ক গম্ভীর ভাবটা সরিয়ে দেয়। কুয়ো থেকে জল তুলে তামা ও পিতলের পাত্রগুলি ভরে বলল, নতুন কাপড় আনো মোতি। আজ খুব সাজব।

স্নান ক'রে ঘরে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স। বলল, স্নান্ ক'রে এসো মোতি, আজ তোমাকেও শিঙার করাবো।

নতুন পোষাক বেছে নিয়ে খুদাবক্স পরে। সাদা রেশমের যোধপুরী ও কুর্তা পরে। কপাল থেকে চুলগুলো আঁচড়ে পিছনে সরিয়ে দেয়। প্রশস্ত সুন্দর ললাটের ও কেশের মধ্যবর্তী রেখাটি সুস্পষ্ট হয়। মোতি বলে, কোন পোশাক পরব বল। খুদাবক্স বলে, লাল কিছু নেই মোতি?

লাল মেলে না। জর্দা রঙের ওপর সোনালী সুতোয় হংসমিথুন উত্তকীর্ণ করা বহুমূল্য কুর্তা ও সাল্‌ওয়ার বেছে দেয় খুদাবক্স। সোনালী, সবুজ, লাল ও পাঁলা রঙে কারুকাজ করা একজোড়া মুরেঠা বেছে রাখে।

মাটিতে আয়না দাঁড় করানো। তার সামনে বসে মোতি। খুদাবক্স সুর্মা পরিয়ে দেয়। মেহেদীর আরকে তুলি ডুবিয়ে রাঙিয়ে দেয় আঙুল। মোতি বলে, আতর আনব খুদাবক্স?

—কিঁউ নহীঁ?

শ্বেতমর্মরের কারুকার্য খচিত বহুমূল্য আতরের আধার। উজাড় ক'রে মোতির চুলে ও পোশাকে দেয় খুদাবক্স। নিজেও লাগায় সযত্নে। বলে, কিছু ফুল—

একমুঠো জুঁইফুল আনে মোতি তার বাগান থেকে।

বিছানায় মোতির বেনারসী বিছিয়ে দিয়েছে খুদাবক্স। ফুলগুলো তার ওপর ছড়িয়ে দেয়। মোতির হাত ধরে বসায় তার সামনে।

জফরির ফাঁক দিয়ে যে সকালের রোদ আসে তার চিত্রবিচিত্র আলপনা পড়ে তাদের ওপর। অনিমিখ দেখে মোতিকে খুদাবক্স। ভাষার অতীত কোন্ অনুভূতিতে আছন্ন পড়ে মোতির হৃৎপিণ্ড। গলায় স্বর ফোটে না। কোন মতে বলে, কেন এত সাজলে?

আঁখি অনিমিখ। স্বর নীচু, ওষ্ঠ উচ্চারণ ক'রে, আজ হোলি মোতি।

—কোন হোলি

—আমার আর তোমার হোলি। এমন ক'রে হোলিতে শানাই বাজছে মোতি শুনতে পাচ্ছ না? ভ্রমর আঁখিতে মুক্তা সঞ্চার হয় নিমেষে। খুদাবক্স বলে, আজকের দিনের বুকে কোন তাল বাজছে মোতি কান পেতে শোন। আমিত আখ্‌রী এক লগনের বাজনা শুনছি মোতি। চারিপাশে মৌতের কোনো পরওয়ানা আমার কানে নেই। এ দিন আমার কাছে সেই দিন, যেদিন আমার তোমার প্রথম দেখা হয়। আজকের হোলিতেও রঙ ঢেলে দিয়েছে মালিক, নহবতে পুকার দিয়েছে—আমাকে আর তোমাকে পাত্তা পাঠিয়ে দিয়েছে যে এবার খেলে নিতে হবে। বল মোতি, আজকের দিনেই'ত তোমাকে সাজাব।

ধূপের ধোঁয়ার চেয়েও ক্ষীণ সুরভি মোতির কণ্ঠে,—আরো বল।

—বলব মোতি, সব কথা আজ পুরা ক'রে দেব। এক ইনাম তুমি শুধু মঞ্জুর কর মোতি, হুকুম দিয়ে দাও, তোমার খুদাবক্স যেন শেষ অবধি তোমার নামকেই পুকার দিয়ে যেতে পারে।

বিন্দু বিন্দু মুক্তা ঝরে। খুদাবক্স বলে, এমন দিনে কাঁদবে তুমি মোতি? এখনো'ত সব কথা তোমাকে বলিনি।

—বল।

কোন গভীর আবেগে মন্ত্রোচ্চারণ করে খুদাবক্সের গম্ভীর কণ্ঠ, কোন কাজী এসে মঞ্জুর করাবে না, আমার তোমার সাদীতে, যত কথা তবে আমিই বলি—

—বল।

—তবে বল মোতি, আমার কথা শুনে বল, আর কোন আফশোষ নেই মনে,

—আফশোষ নেই মনে—

—যা মিলল তা' সেলাম জানিয়ে নিলাম, আর কোন পিয়াস রইল না।

—পিয়াস—

—বল বল মোতি!

—পিয়াস রইল না।

—তবে আর দেরী কিসের মোতি...।

মোতিকে কাছে আনে খুদাবক্স। বলে, কে আয়না ধরে আমাদের নজর করাবে মোতি, আমার চোখে তুমি দেখ।

অশ্রু-টলটল চোখে তাকায় মোতি। খুদাবক্স সমুদ্রের মত টানে তাকে। ঢেউ হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে মোতি। দেহে নয়, রক্তে নয়, সমস্ত সত্তায় গভীর যন্ত্রণা ও আনন্দের এক সুমহান মিশ্র অনুভূতি জাগে। আকাশ হয়ে ভালবাসে খুদাবক্স, ছোট পাখী হয়ে আশ্রয় নেয় মোতি। মোতি, মোতি, তার নাম তাকেই শোনায় খুদাবক্স।

তারপর সযত্নে তুলে ধরে প্রিয়াকে। গভীর ও একাগ্র যত্নে বিস্রস্ত প্রসাধন ঠিক ক'রে দেয়। চুল আঁচড়ে দেয়। অশ্রুলাঞ্ছিত চোখ মুছে সুর্মা পরায়, বেঁধে দেয় মুরেঠা।

তাকে সাজিয়ে দেয় মোতি, মুখ মুছিয়ে দেয়। পায়ে নাগরা পরায়, কোমরে কোমরবন্ধ বাঁধে, তার হাতের কাজ করা আঙিয়া পরায়, উষ্ণীষ বেঁধে দেয় লোহার জালের ওপর।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে খুদাবক্স বলে, আজ সারাদিন ধরে এক কথা স্মরণ রাখবে মোতি।...চিন্তা করবার কিছু নেই, না আমার জন্যে, না তোমার জন্যে। যেমন এক জিন্দিগী মিলেছিল, লাখো জিন্দিগীর সমান ক'রে দিলাম তাকে।...ভুলবে না।

—কভি নহীঁ।

অঙ্গনে এসে ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে। পথ যেখানে দ্বিধা হয়ে গেছে, সেখানে এসে স্বরূপ উষ্ণীষ হেলনে অভিবাদন জানায় খুদাবক্স। মোতি চলে যায়, যতদূর তাকে দেখা যায়, খুদাবক্স দেখে। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পৌঁছে যায় তার চৌকিতে।

তাকে দেখে নেমে দাঁড়ান জবাহির জী। বলেন, হুঁসিয়ার বেটা, দূরবীণ দিয়ে দেখলাম যত কামান সব তৈরী, ওদের ফৌজও তৈরী। কখন আক্রমণ করে ঠিক কি?

—জী। ব'লে নিজের চৌকিতে বসে খুদাবক্স। সহকারী দুইজনকে দেখে নেয়। দুইজনই ছোকরা। একজন একটু ভয় পেয়েছে বোধহয়। প্রায় নীরস কণ্ঠে বলে, কখনো চলে যেওনা চৌকি ছেড়ে।

—হ্যাঁ খাঁ সাহেব।

কামানের পাল্লা ঠিক আছে। গোলাবারুদ ঠিক আছে। বাঁ হাতটা বড় ব্যথা করছে। প্রয়োজনের সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা ত' করবে না?

নীরব, চুপচাপ শত্রু পক্ষ। তার অর্থই হুঁসিয়ারীর দরকার এই পক্ষে। বেশ, সে

হুঁশিয়ার আছে। খুদাবক্স জানে সইয়ার দরওয়াজার বাইরে ফাটল ধরেছে। মিস্ত্রীরা গতরাত্রিতে কাজ করতে পারেনি।

খুব ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে তার নিজেকে। বুদ্ধি ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা আছে। খেয়াল ঠিক থাকবারই ত দরকার বেশী।

বেলা কত হবে? দশটার বেশী নয়। কেল্লার দিকে একবারও তাকায় না খুদাবক্স। জানে মোতি তার চৌকিতে অবিচল থাকবে।

এইরকমই ছিল সেই হোলির সকাল। কি আশ্চর্য সেই লগ্ন যখন মোতিকে প্রথম দেখেছিল খুদাবক্স। দুই করপুটে তুলে ধরে একটি মুখ নিরীক্ষণ করবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। পরে কতদিন কত কবিতায় আর শেয়রে সাজিয়েছিল সেই নাম খুদাবক্স, আজ সে কথার কিছুই মনে পড়ে না। জাগে শুধু দুই অক্ষরের একটি নাম—মোতি। দীর্ঘ বিচ্ছেদ ব্যবধানের সুদূর প্রান্তে যে প্রিয়নাম এক প্রিয়ার মতোই আঙিনার দুয়ারে নিশিভোর প্রতীক্ষা ক'রে থাকে।

আঠাশ বছরের জীবনের গত সাতটা বছর—যেদিন থেকে সে মোতিকে দেখেছিল—সমস্তটা পরিক্রমা ক'রে তার মন। কই, একটা দিন, একটা ক্ষণেও ত মোতিকে হারায়নি সে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তার কাছে ছিল মোতি, তাকে ধরে রেখেছিল প্রেম দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে। সাদী আবার কেমন ক'রে হয়?

মোতি আর মোতি, দুই অক্ষরের এই একটি নাম ঘিরেই সে কত না গান রচনা করল। কোনো অবিচার কি সে করেছে মোতির ওপরে? কষ্ট দিয়েছে কি তাকে? কষ্ট দিয়েছে বা যত, পেয়েছেও তো তার চেয়ে বেশী। তাই সেখানে কোন ঋণ নেই। আর মোতির কাছে তার ঋণ কেমন ক'রে থাকবে? থাকলেও সে ঋণ শোধ করবে কি দিয়ে? হৃদয় মন দিয়ে? কিন্তু মোতিত আলাদা নয় তার থেকে। তাহলে সেই হৃদয় মনের পুষ্পাঞ্জলি ফিরে এসে তো তার নিজের পায়েই পড়বে। সে কি কখনও হয়? নিজের কাছে কি ঋণ শোধ ক'রে কেউ? ক্ষমা চায়? সে সময়ই বা মিলবে কখন? তারচেয়ে কিছু অপরাধ তার থেকে যাক মোতির কাছে। ক্ষমা চাইবার একটা চির অবকাশ রয়ে যাক, সেই ভাল।

মোতি, মোতি আর মোতি! কত সুন্দর করেছ এই পৃথিবী ভগবান, কত প্রেম দিয়েছ মানুষের মনে, শিশুকে দিয়েছ পবিত্র সৌন্দর্য, কত মাধুরীতে সঞ্জীবিত করেছ তোমার আকাশ বাতাস মাটি। তোমার নাম ক'রে তোমাকে কি নতি জানাবে খুদাবক্স? মানুষকে সে বলে—খোদার রহমত তোমার ওপর বর্ষিত হোক। খোদাকে তবে মানুষের কথাতে নতি জানাচ্ছে খুদাবক্স। জানাচ্ছে তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নতি! তোমার দিনান্তিক প্রাপ্য অর্ঘ ও নির্মাল্যের স্তূপে তাকেও তুমি চিনে নিও।

তার বাবা আর মা-র কথাও স্মরণ করল খুদাবক্স। আজ এই মুহূর্তে যখন তার বোধ হচ্ছে মন পূর্ণতম হয়ে উছলে উছলে পড়ছে, তখনই ত প্রিয়জনকে স্মরণে আসে। আনোয়ারের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখের হাসি, পরীর মমতা মাখানো চোখের স্নেহদৃষ্টি মনে পড়ে খুদাবক্সের। আর মনে পড়ে একগোছা রুক্ষ চুল, যা কোনদিন বেণীর বাঁধন মানত না। মা আর বাবাত দেখল না মোতিকে। দেখল না যে, খুদাবক্সের যে জীবনের জন্যে তাদের ভাবনাচিন্তার অন্ত ছিল না, সেই জীবনকেই ভালবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, বেদনা দিয়ে একেবারে ভরে দিল মোতি।

পিতার কাছে শপথ সে ভোলেনি, তাই এই সুযোগ এসেছে তার জীবনে। এক জীবনে সে মোতিকে পেল, আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পেল, এমন ক'রে ক'জন পায়? দুই পাওয়াই এক হয়ে গেল। পূর্ণ হয়ে গেল তার মন। অমৃতের আস্বাদ জানল সে।

আর ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, আফ্‌শোষ নেই।

বেলা বারোটা বাজে। এমনি সময় নৈটিভরা যাবে স্নানে ও আহারে। এই আক্রমণের ক্ষণ। দূরবীণ নামিয়ে রাখলেন লেফটেন্যাণ্ট স্টাট। গত আধঘণ্টা ধরে তিনি সাঁইয়ার দরওয়াজায় নজর করছেন। চৌঘুপির আড়াল দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ছে গৌরবর্ণ সেই যুবক একাগ্র হয়ে নিশানা ঠিক ক'রে বসে আছে। গত আটদিন বড় জ্বালিয়েছে ছোকরা। এই কামানটা, আর কেল্লার কামান কটা যদি থামিয়ে দেওয়া যেত!

বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষের বিয়াল্লিশটা কামান একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠল। প্রথমে একুশটা, এবং পরে একুশটা, এই নিয়মে তারা অবিরত গোলাবর্ষণ করতে লাগল।

আশেপাশে গোলা পড়ছে, টুকরো টুকরো হয়ে মৃত্যু ছড়াচ্ছে, এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করে না খুদাবক্স। গোলার জবাবে গোলা ছোঁড়ে।

সাঁইয়ার দরওয়াজার গোলা চালনা দেখে কেল্লাতে ঘনগর্জের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোসের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মোতির দিকে গর্বের সঙ্গে তাকান তিনি। স্বীকৃতিতে মোতিও হাসে। ঘোস মহানন্দে কামান চালান আর বলেন, আমার বেটা আমার কিরকম নামওয়ারী করছে শুনছ মোতি?

—শুনছি ওস্তাদ।

—এই তো বেটার কাজ। বলেন আর অভিনিবেশ সহকারে ধূলিসাৎ করেন শঙ্কর মন্দির। বিপক্ষ বিপর্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্য ব্যাটারীতে চলে যায়। মহাত্রাসে পুনর্বার গোলাবর্ষণ করেন ঘোস। এগিয়ে চলে যুদ্ধ।

বিকেলের সূর্য হেলে পড়ে। খুদাবক্সের মনে হয় সহসা শত্রুর ব্যাটারী থেকে একাধিক কামান তার দিকে গোলা ছুঁড়ছে। তাহলে ত' মুস্কিল। গোলার আঘাতে তার পঞ্চাশ হাত দক্ষিণে একটা চৌঘুপি ভেঙে বড় ফাটল হয়ে যায়। এমনি সময় সেখানে একটা ছোট কামান এনে বসায় বাহ্‌রাম। কোন কথা না বলে পলতেতে আগুন ধরায়।

একজোড়া কামানের পালটা জবাবে সাময়িক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইংরেজ ব্যাটারী।

ঠিক সন্ধ্যার আগের মুহূর্ত। সহসা ছুটতে ছুটতে আসেন দেওয়ান রত্নকরণ। বাহ্‌রামকে বলেন, শীঘ্র কেল্লায় যাও বাহ্‌রাম। যাকে হয় নিয়ে এসো অরছা দরওয়াজায়। পায়ে চোট লেগেছে রহমৎ খাঁ সাহেবের। আমি এখানে থাকছি।

বাঁ হাতখানা টনটন ক'রে। পাল্লা ঠিক করতে অসুবিধা হয় খুদাবক্সের। সহসা গোলা এসে পড়ে পেছনে। ধোঁয়া আর গরম কাটলে দেখা যায় তার সহকারী ছোকরাদের মধ্যে একজন জখম হয়েছে। কিন্তু আর একজন কোথায় গেল? স্তম্ভিত খুদাবক্স দেখল নীচু হয়ে পাঁচিল ধরে ধরে সে পালাচ্ছে। বেওয়াকুফ্‌! খুদাবক্সের ধমকে সে কেঁদে ফেলল। বলল, হুজুর আমি পারব না! আমি পারব না!

সম্ভবত নতুন সৈনিক। কিন্তু দয়া দেখাবার সময় নেই। পিস্তল তুলে নিশানা করল খুদাবক্স। ভয়ে ভয়ে ফিরে এল সে। আতঙ্কে কাঁদতে লাগল আর কম্পিত হাতে গোলা

তুলে ধরল।

এমনি সময়ে তার পাশে এল মোতি। ঘোড়া মুখ ফিরিয়ে হ্রেষা করে ফিরে যেতে চাইছে। কথা ডুবে যাচ্ছে কলরোলে।—হুসিয়ার খুদাবক্স! ব'লে মোতি মাথা নীচু ক'রে ছুটে কাছে আসে। বলে, অরছা দরওয়াজায় যাচ্ছি।

—কোথায় যাবে মোতি? এখানে উঠে এসো। আমার ছোকরা ভয় পেয়েছে। এর হাতেই বে-কায়দায় গোলা ফেটে খুন হয়ে যাব! ওপাশে যাও। তাড়াতাড়ি করো...

মোতি গোলা তুলে দেয় হাতে। গোলা ছুঁড়েই মাথা নীচু করে। কামানের নীচে দু'জনে একটু হাসে। ইংরেজের গোলা এসে ফাটে কিছুদূরে একটা ঘাসের স্তূপে। নেচে ওঠে আগুন। ফাল্গুনের বাতাস তাকে ছড়িয়ে দেয়। পেছনের বাড়ীগুলো থেকে আর্তনাদ ওঠে। মৃত সওয়ার রেকাবে পা রেখে মাটিতে আছাড় খাচ্ছে। তাকে ফেলে দিতে চেষ্টা করে আতঙ্কিত ঘোড়া।

—মোতি, ভয় করছে না ত'?

—না খুদাবক্স!

আবার ফেটে পড়ে গোলা। ভিজে বালির বস্তায় পড়ে বিকল হয়ে যায়। আগুনের আভার চেয়েও দীপ্ত হয় খুদাবক্সের মুখ কোনো অন্তরের আগুনে। বলে আর কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না মোতি!

আগুন জ্বলবার শব্দে কারা হাজার কণ্ঠে মোতির হ'য়ে পুকার দেয়, না—না—না!

তপ্তকামানে গোলা ভরে মশাল লাগায় খুদাবক্স। পাণ্ডুর দেখায় তার মুখ। দুই পাশের পাথর কাঁপে। গোলাগুলো অগ্নিপিণ্ডের মতো আকাশ দিয়ে আসে যায়। মাতাল আনন্দে হাসে খুদাবক্স। বলে, এর চেয়ে ভাল সময় আর কি মিলত মোতি?

—নহীঁ খুদাবক্স।

—মনে কর আখ্‌রী দিনে আমাদের সাদী হচ্ছে।

—হাঁ, জরুর।

নৈপুণ্যের সাথে লড়ে খুদাবক্স। মুগ্ধ হতে সময় পায় না। মোতি গোলা দেয়, বারুদের গুঁড়ো তোলে কাঠের চামচে, নতুন পলতে দেয়।

রক্তাক্ত সন্ধ্যা। কামান গর্জন ও মৃত্যু কলরোলে যেন পৃথিবীর অন্তিম দিবস সূচিত হয়েছে। খুদাবক্স আবার হাসে—কত আলো দেখেছ মোতি?

হঠাৎ ভীমনিনাদে যে গোলাটা সাঁইয়ার দরওয়াজার নীচে ফেটে পড়ে, তার গর্জনে ডুবে যায় খুদাবক্সের কণ্ঠ—

ধোঁয়া কমতে মোতি দেখে সিঁড়িতে বসে পড়েছে খুদাবক্স। রক্তাক্ত তার দেহ। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে, চালিয়ে যাও মোতি, বন্ধ কোর না।

অধর দংশন ক'রে মোতি পলতেয় আগুন দেয়। গর্জন করে কামান। এই ধোঁয়া ও মৃত্যুর ভেতর থেকে ছুটে আসে বাহ্‌রাম। খুদাবক্স বলে, একবার হাত বাড়াও বাহ্‌রাম!

কামান ছাড়তে পারে না মোতি। বলে, কোথায় লেগেছে খুদাবক্স? যন্ত্রণায় পাংশু মুখে খুদাবক্স বলে, ডান হাতে মোতি।

রক্তাক্ত ডান হাতখানা ঝুলছে। বাঁ হাত কামড়ে খুদাবক্স একটা চীৎকার বন্ধ করে। রক্তশূন্য মুখে নীল চোখ দুটো জ্বলে। বলে, এ-ও আখ্‌রী চোট্ নয়।

মোতি মশাল দেয়। খুদাবক্স পলতেটা লাগায়। গর্জে ওঠে কামান। কামানের পাশে ঝরে পড়ে খুদাবক্সের রক্ত। বাহ্‌রাম বলে, মোতি, আমি যাব আর আসব। কাউকে না আনলে কে খুদাবক্সকে কেল্লায় নিয়ে যাবে? তুমি পারবে'ত?

—পারব।...মোতি কামান চালায়। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কামানের গায়ে মাথা রাখে খুদাবক্স। অধর দংশন ক'রে। ঠোঁটে রক্ত ফুটে ওঠে। একটু হাসে। বলে, অনেক কথা দিয়েছ মোতি। ভুলবে না।

—কভি নহী°।

এবার মোতির কামানের জবাবে ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে। বিপক্ষ পরাজিত হচ্ছে। কেল্লার জলের আধার দু'পুরে উড়িয়ে দিয়েছেন স্টাট। এখনো কি এই ধৃষ্টতা সহ্য হয়? তাদের গোলা এসে ফাটে ঠিক আগের নিশানায়। ধোঁয়া ও আগুনে জ্বলে যায় পরিবেশ। সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে পরন্তপ ও বাহ্‌রাম। এবার গোলার টুকরো বিঁধেছে বুকে। তাজা রক্ত কলিজা ছিঁড়ে উঠছে ঝলকে ঝলকে। অসহ্য যন্ত্রণায় জড়িয়ে যায় খুদাবক্সের গলা—মোতি!

কথা কইতে বুক ভেঙে যায় মোতির—কোথায় লেগেছে খুদাবক্স।

—মোতি! ব্যথার কথা বলে না, জখমের নিশানা দেয় না। শুধু মোতিকেই ডাকে খুদাবক্স। গলা জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, যেন মদ খেয়েছে সে!

—খুদাবক্স, ভাই...! পরন্তপ অসীম শক্তিতে তাকে তুলে ধরে ঘোড়ার পিঠে। পাশের ঘোড়ায় বসে মোতি তার বাঁ হাত ধরে। বাহ্‌রাম খুদাবক্সের চৌকি নিয়ে নেয়।

প্রত্যেকটা ঝাঁকুনীতে খুদাবক্স যন্ত্রণায় মাতাল কণ্ঠে বারবার ডাকে—মোতি, মোতি! বুকের ভেতরটা ভেঙে যায় মোতির। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন লোহার আঙুল দিয়ে ধরেছে, কাঁদতে দেবে না তাকে। পরন্তপের আঙুল ছাপিয়ে খুদাবক্সের রক্ত ঝরতে থাকে খুদাবক্সেরই কোলে।

কেল্লায় চড়াস্ত কোলাহল ও বিভ্রান্তি। কামানের শব্দ এলোমেলো হাজারটা মানুষের ছুটোছুটি। বাগিচা বুরুজের নীচের ছোট কামরাতে খুদাবক্সকে একজন রিসালার সাহায্যে নামায় পরন্তপ। জল চাই, সাহায্য চাই, ছুটে চলে যায় সে। তার জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায় পাথরের দালানে।

রক্তে মাটি ভিজে যাচ্ছে। যতবার মোছে মোতি, ততবারই রক্ত ওঠে ফিনকী দিয়ে। এত রক্ত কোনখানে ছিল? মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মোতি। ডাকে,—খুদাবক্স!

মর দেহের চেতনার শেষ বাঁধনে সেই আহ্বান পৌঁছে যায়। চোখ খোলে খুদাবক্স। অস্ফুটে বলে,—মোতি!

—এই ত' আমি খুদাবক্স!

—হাঁ মোতি। বলে কম্পিত বাঁ হাত দিয়ে বাতাস ছুঁয়ে আসে খুদাবক্স। মৃত্যুজয় ক'রে একটু নিমীলিত হাসে। বলে, মোতি...পুরা হো গিয়া।

সব পূর্ণ হয়ে গেল।

মৃত্যু খুদাবক্সের মুখে ঢেলে দিল প্রশান্তি। স্থির ক'রে দিল দেহ। বন্ধ ক'রে দিল চোখ। মাথা থেকে রক্তাক্ত উষ্ণীষ খুলে নিল মোতি। গুচ্ছে গুচ্ছে চুল ছড়িয়ে পড়ল।

তার মুরেঠা ও খুদাবক্সের উষ্ণীষ খুলে ঢেকে দিল দেহ। স্নেহ, প্রেম ও বেদনার

অতীত গভীরতম কোন মূক অনুভূতিতে খুদাবক্সের উষ্ণ ললাট চুম্বন করল মোতি। মুখ ঢেকে দিল। তারপর বলল, খুদাহাফিজ খুদাবক্স।

সব শোধ। এবারকার মত সব শোধ হয়ে গেছে। তারপরে আরো কিছু রইল কি? বিভ্রান্ত, দিশেহারা প্রায় লঘু পদক্ষেপে মোতি এগিয়ে গেল। মাথার ভেতরটা তার একেবারে হাল্কা বোধ হচ্ছে, দেহে কোন অনুভূতি নেই। হ্যাঁ, আর একটা কাজ আছে। কি কাজ, কি কাজ? হ্যাঁ, ঘোসকে খবরটা পৌঁছুতে হবে। ঘোস রয়েছেন ঘনগর্জ-এর কাছে। কিন্তু ঘনগর্জ নীরব কেন?

ঘনগর্জ নীরব কেন? মোতির প্রশ্ন আর্ত চীৎকারে ফেটে পড়ল। তার জবাবে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন কঠোর হৃদয় প্রৌঢ় সৈনিক রঘুনাথ সিং রিসালাদার। ঘনগর্জ আর গর্জন করবে না। ঘনগর্জের গর্জন শেষ হয়ে গেছে। ছুটে চলল মোতি। ঠিক এই সময়েই চলে গেলেন ঘোস? হায় খোদা, এই কি তোমার ধ্যান ছিল?

ঘনগর্জ-এর পাশে বসেছিলেন রানী। রক্তবর্ণ পতাকায় ঘোসের দেহ আচ্ছাদিত। ঘোসের মাথা কোল থেকে নামিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর প্রাচীরে মাথা রেখে শিশুর মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন—

—আপ্ রো রহী° হ্যায় সরকার? বড় বিস্মিত হ'ল মোতি। কাঁদছেন রানী? রঘুনাথজী, দিলীপজী, জবাহির সিং, পরন্তপ, সবাই কাঁদছে? চুপ ক'রে আছে সবাই? এমনি ক'রে কি শোক করে? এই কি শোকের আদত? তাকে এত শেখালেন রানী, আর আজ তিনিই আসল আদত ভুলে গেলেন? মূর্খ সবাই, এরা বধির, এরা মূক! মোতি যা দেখতে পাচ্ছে এরা তা দেখছে না কেন? কেন এরা শুনছে না যা সে শুনতে পাচ্ছে? মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে নির্দেশ, তবু ত' কেউ এগিয়ে আসছে না?

তুমি কি বলছ খুদাবক্স? এই রকম শোক কি চেয়েছিলে তুমি? এই আদত দিয়ে কি তোমার মর্যাদা করব!—কভি নহী° মোতি।

ওস্তাদ ঘোস খাঁ, আপনার আমার সম্পর্ক ত' হৃদয়ের গভীরে বাঁধা। বলুন আপনার ঋণ কি অশ্রুজলে শোধ দেব?—কভি নহী° বেটি।

এগিয়ে গেল মোতি। স্পষ্টকণ্ঠে বলল,—আপনারা পিছে যান। কিশোরজী আমার পিছনে যান। গোলা দিন, বারুদ দিন।

শ্রদ্ধা ও চেতনা যুগপৎ কশাঘাত ক'রে ফিরিয়ে আনল সম্বিৎ। এগিয়ে এলেন কিশোর সিং পরবার। গর্জন ক'রে উঠল ঘনগর্জ। স্তম্ভিত হল প্রতিপক্ষ। রজনী প্রথম যামা। শত্রুপক্ষকে আজ অন্তিম্ চোট্ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তবু কেমন ক'রে জবাব আসে? তারাও কামানের পাল্লা ঠিক করল।

গম্ভীর নিনাদে কাঁপতে থাকে আকাশ। আঁধার চিরে চিরে অগ্নিপিণ্ডের মত গোলা এসে পড়ে কেল্লায়। অশ্রুহীন চোখে লড়ে চলে মোতি। এই'ত ভাল হল খুদাবক্স। এতদিনে আমি তোমার খুব কাছে এলাম। আর কোন বিচ্ছেদ রইল না। কত গভীর আর সুন্দর তোমার প্রেম খুদাবক্স!

ইংরেজের গোলা এসে ফেটে পড়ে। স্থির সংকল্পের অগ্নিশিখা হয়ে মোতি যুদ্ধ ক'রে। কাপ্তেকরীর ওপর ইংরেজের ব্যাটারী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কত প্রেম দিলে খুদাবক্স, প্রেম দিলে আর আশ্রয় দিলে তোমার বুকের মধ্যে। এখন ত' তুমি আমার পাশে আছ। পাশে আছ, ঘিরে আছ, বাতাসে তোমার সৌরভ পাচ্ছি, তোমার

স্পর্শ পাচ্ছি আমার ললাটে, কপোলে, অধরে, তবে আর কোন্ আফশোষ খুদাবক্স!

কোন্ ভীমগর্জন শুনছি খুদাবক্স? অথবা এ কোন্ সঙ্গীত? এত আলো আর এত শব্দ? কত উৎসব সজ্জায় সেজেছ খুদাবক্স? কত আগ্রহে উৎসাহ দিচ্ছ আমাকে?

আলো, আলো, আর আলো। এত আলো কোথায় ছিল? এই আলোর মন্ত্রে তুমি আর তুমি রইলে না খুদাবক্স, আমার হয়ে গেলে, একেবারে আমার মধ্যে মিলে গেলে।

দিনের আলোর মত ক'রে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল, তার ধোঁয়া কমতে দেখা গেল মোতিকে। কামানের চাকার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। লালে লাল হয়ে গেছে চারিপাশ। ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল সবাই। রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন গ্রীবা ঢেকে দিল একজন।

মনে হল কোন কথা বলতে চাইছে মোতি। থর থর ক'রে কাঁপছে ওষ্ঠাধর। ঝুঁকে পড়ে পরন্তপ। জল দিয়ে ভিজিয়ে দেয় তার ওষ্ঠ। মোতি ফিস ফিস ক'রে বলল, বাহ্‌রাম, বাহ্‌রাম! পরন্তপের আদেশে একজন চলে গেল। অধরের পাশ দিয়ে ক্ষীণ ধারায় গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। মুছে নিল পরন্তপ। ছুটতে ছুটতে এল বাহ্‌রাম। ঝুঁকে পড়ে বলল—মোতি! মোতি!

—বাহ্‌রাম, বাগিচা বরাবর ছোট কুঠরীতে খুদাবক্স আছে...

—হাঁ মোতি!

—তার পাশে রেখ...কথা দাও!

—হাঁ মোতি—

মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে বাহ্‌রাম। মোতি প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে কাকে খোঁজে। সকলের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার চোখ ফিরে আসে। তারপর চোখ বন্ধ ক'রে, একটু লজ্জা ও মধুর হাসি ফোটে ঠোঁটে। বলে,—আভি আই খুদাবক্স...

লগ্নপুরে গেল। আর কোন বাধা রইল না। এত বাধা, এত বিচ্ছেদ, এত প্রতীক্ষা সব পূর্ণ হয়ে গেল এই লগ্নে। খুদাবক্স আর মোতি, দুইনাম এক হয়ে গেল, দুই প্রাণ এক হয়ে গেল, বড় সমারোহে এই শেষ উৎসবে তারা মিলে গেল। মৃত্যু পরাজিত হয়ে অমৃতের রূপ নিল, আর কোন মহাচেতনায় সেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করল মোতি আর খুদাবক্স।

মোতির অনিন্দ্য-শুভ্র মুখে, ঘনকৃষ্ণ আঁখি-পল্লবে, প্রবালরক্ত ওষ্ঠাধরে, নির্মল ললাটে এমন গভীর হয়ে ছড়িয়ে গেল সেই অমৃতের উপলব্ধি, যে দেখে ধন্য হল সবাই। অশ্রু মুছে ফেলল তারা।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পাশাপাশি কবর বানিয়ে নতুন ক'রে বাসর সাজাল বন্ধু সৈনিকরা। মহাল থেকে রানীর আদেশে বহুমূল্য রক্তবর্ণ জরী ও রেশমের আস্তরণ আনলেন রঘুনাথজী। শিবমন্দিরের বাগান থেকে উজাড় ক'রে পলাশ, বকুল ও জুইফুল এনে ছড়িয়ে দিল বাহ্‌রাম। তারপর সন্তর্পণ শ্রদ্ধায় বহন ক'রে আনা হ'ল দুইটি কাফন। পাশাপাশি দুইজন—খুদাবক্স ও মোতি।

লাল রেশমের আস্তরণে মুড়ে তরবারি ও পাশখুব সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। তারপর মুঠো মুঠো মাটি।

মাটির ওপর মাটি দিয়ে যখন সমাপ্ত হল সমাধি, তখন উঠে দাঁড়াল বাহ্‌রাম ও

পরন্তপ। মুরেঠা উন্মোচন করল। সঙ্গে সঙ্গে নগ্নমস্তকে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালেন রঘুনাথ সিং, জবাহির, কিশোর, দিলীপ, জুহী। সকলের সম্মিলিত অশ্রুধারায় নিষিক্ত হল মৃত্তিকা।

নক্ষত্রখচিত নিশিথিনী, পুষ্পগন্ধে উত্তাল বাতাস, সকলে অশ্রুত এক মহান সঙ্গীতে শেষ প্রণতি জানাল।

শুধু স্থির হয়ে পরম মমতায় গ্রহণ করল মৃত্তিকা।

সেই চরম লগ্নে মৃত্যু আর বিচ্ছেদ রইল না। মৃত্যুকে জয় করল প্রেম। তাই মৃত্যু হয়ে গেল মিলনক্ষণ। মহামিলনের সেই শুভলগ্নে মৃত্যুকে কত তুচ্ছ ক'রে দিল জীবন। জীবনের জয়গান রচনা করে চলে গেল খুদাবক্স ও মোতি। সেই গান পরে অন্য অধরে স্ফুরিত হবে, অন্য কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, আর দেশ, কাল ও সময়ের বাধা তুচ্ছ ক'রে দুর্নিবার ঝনঝনায় অনাদি অখণ্ডকাল বেজে চলবে। সেই সার্থকতাতেই সার্থক হল তাদের প্রেম। চরম পূর্ণতার বোধে বিলীন হল যে প্রেম তার কোন্ আফশোষ?

॥ সমাপ্ত ॥

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা

অশোক মিত্র

অজ-পাড়াগাঁ থেকে ধ'রে এনে একটা হাবা ছেলেকে ব্যস্তমুখর নগরের ভিড়ে ছেড়ে দাও; লেখাপড়া শেখানোর দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারেও না ভাবলে চলবে; শুধু সে ঘুরে বেড়াক নগরের রাস্তায় ঘাটে, দেখুক গাড়ি বাড়ি বিদ্যুতের ঝলক; এক মাসের মধ্যে অন্য মানুষ হ'য়ে যাবে সে, তার চলনে-বলনে-বুদ্ধিতে উজ্জ্বলতা ছুঁয়ে যাবে, তার দক্ষতা বাড়বে অনেকগুণ।

অত্যন্ত মেঠো কথা এটা, সাধারণ ভাবনাতেই যা ধরা পড়ে। এই প্রায়-তুচ্ছ সিদ্ধান্তটিকে ব্যবহার ক'রেই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে মার্কিন ধনবিজ্ঞানী এ্যালীন ইয়ং অর্থনীতির একটি চমৎকার সূত্র বাতলেছিলেন। কোন দেশে যখন শিল্প-আলোড়ন দানা বেঁধে ওঠে, একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কলকারখানার গোড়াপত্তন হয়, চারদিকে উৎপাদন আর বিনিয়োগবৃদ্ধির সমারোহ, তখন যে শুধু বিভিন্ন শিল্পের পারস্পরিক বিনিময়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মোড় ফিরে যায় তা নয়। এমন তাঁর কর্মব্যস্ততার ফলে আবহাওয়াই অন্যরকম হ'য়ে যায়; কারখানার নিশ্বাসে আকাশ আরক্ত হ'য়ে আসে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়াসে প্রতি দিগন্তে একটি চকিত ভাব ছড়িয়ে পড়ে। লোকের মুখে মুখে অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে চিন্তা, বৈজ্ঞানিক সূত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক প্রণালী নিয়ে আলোচনা, হঠাৎ এক ধাপে সমাজের সামগ্রিক জ্ঞানের পরিমাপ অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সাধারণ লোকের দক্ষতা বাড়ে, সাহসও সেই সঙ্গে; যা শুরুতে ছিল বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শিল্পের পত্তন, তা' রূপ নেয় এক বিরাট আশাবাদের মহীরুহে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রগতির বেগ ও বিস্তার দুটোই লাভবান হয়। জাতীয় উন্নতির এই যে গোপন কাঠি, ইয়ং তার নাম রেখেছিলেন potential indivisibility, যেহেতু এই সম্ভাব্য শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায় একমাত্র যদি একটি অখণ্ড, সমগ্র চেষ্টা হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য।

অর্থনীতিকে বলা হ'য়ে থাকে 'হতাশার বিজ্ঞান'। কিন্তু আসলে জাতীয় চেতনায় সুদৃঢ় আশাবাদ সঞ্চার করতে না পারলে দেশের ধনসম্পদ, দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান, শিল্পবাণিজ্যের সম্ভার, সমস্ত কিছুই অসম্ভব। বিনিয়োগের প্রসার সর্ববিষ আর্থিক উন্নতির মূল সূত্র। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সাহস, ঝুঁকি নেবার মানসিক প্রস্তুতি, সংগঠনপ্রতিভা, এবং, অন্য সব কিছু ছাপিয়ে, দেশের লোকের ত্যাগস্বীকার করবার মতো প্রবণতা। এই প্রবণতা থাকতে পারে যদি লোকের মনে আশা থাকে, ভবিষ্যতের স্বপ্নে যদি তাদের বিশ্বাস থাকে। যেখানে অনীহা বা অনাস্থা, কর্মকর্তাদের হাজার উপরোধেও সেখানে অসফল হ'তে বাধ্য। এ-উক্তির মানে অবশ্য এই নয় যে, যে-মুহূর্তে অনীহা এসে জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে, সঙ্গে-সঙ্গে হাল ছেড়ে দিয়ে শুভতর সংযোগের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। বরঞ্চ এ রকম অবস্থায় সমস্ত প্রাথমিক অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার লক্ষ্য হবে এ অনীহাকে জয় করা, জাতির সামগ্রিক চেষ্টার ফলে শতাব্দীর দৈন্যকে যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে লাঘব করা চলে এই সত্য সম্বন্ধে লোক-মানসকে নির্দ্বন্দ্ব করা।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে, স্বীকার করতেই হয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমান্তরালতায় এ ধরনের লোকশিক্ষা বিস্তারের প্রচুর চেষ্টা হয়েছে ও হচ্ছে, যদিও, সাম্প্রতিক কিছু কিছু ঘটনাবলী থেকে মনে হয়, কোথাও কোথাও সে সাযুজ্য নিটোল হয়নি, অতএব অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছে।

এ রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিচার করা শ্রেয়। এই শতাব্দীর গোড়ায়, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ সত্যাগ্রহের মধ্যে, তিরিশ সালের সন্ত্রাসবাদ ও আইন-বিরোধী আন্দোলনের শীর্ষে, সবশেষে অগাস্ট বিপ্লবের সময় পর্যন্ত, একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও আলোড়নের তীব্র প্রবাহ জাতির মেরুদণ্ড সদাশিহরিত রেখেছে। খবর-কাগজের ভাষায় এই উদ্দীপিকে বলা হতো 'জাতীয়তাবোধ' এবং সন্দেহ নেই অনেক ধরনের খাদ মেশানো ছিল তাতে। তাহলেও যে আশাবাদ বাদ দিয়ে জাতি উঠতে পারে না, তীক্ষ্ণ সংঘর্ষের আরম্ভতার মধ্যে বাঁচতে পারে না, এগিয়ে যেতে পারে না, সেই আশার আবহাওয়া সে রকম বোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল। স্বাধীনতালাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্দীপ্তি ফিকে হ'য়ে যায়, কিছুটা বিষাদ, কিছুটা অবসাদ, এমন কি কখনো-কখনো সুবিষ্কম নাস্তিকতা সমাজের অনেক স্তরে ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে আচ্ছন্ন ক'রে আসে। কারণ অবশ্য অনেকগুলোই : যে-উৎসাহ জাতিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তা রাজনৈতিক মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে ঝিমিয়ে আসে; সে বিশেষ রূপ নিয়ে রাজনৈতিক মুক্তি এলো, অনেকের কাছে তা মোক্ষ বলে মনে হলো, তাঁরা তাই নিজেদের বিষয়ে ক'রে নিলেন; স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের শ্রী-সম্পদ সহস্রগুণ এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে, এ রকম বাষ্পসর্বস্ব ধারণা নিয়ে যাঁরা এতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁদেরও উত্তেজনায় ছন্দপতন ঘটল। প্রাক্-স্বাধীনতা জাতীয় আন্দোলনের সম্ভবত জাদু ছিল এটাই যে যেহেতু তার কল্পনা খুব অস্পষ্ট ছিল, সকলেই নিজের মনের মাধুরী দিয়ে তা পূরণ ক'রে নিতে পারত, পূরণ ক'রে নিয়ে সুখী থাকত, উৎসাহে তপ্ত হ'তে বাধা পড়ত না তাই। যে মুহূর্তে সে কল্পনাশ্রিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ক্রান্তিসময় এলো, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল জাতির সামগ্রিক উৎসাহবোধ।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক হ'য়ে থেকেছে, অন্তত গত দশ বছরের কথা বলা চলে, লোকমানসের এই নিরুৎসাহবোধ। ধনবিজ্ঞানের সাধারণতম সূত্র এগুলো যে জাতীয় বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে হবে, অন্যথা জাতীয় উপার্জনের হার একই রকম থেকে যাবে, উন্নতির সব রাস্তা বন্ধ। বিনিয়োগবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হলো নিবৃত্তি, নিবৃত্তি থেকেই কৃষিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে অধিকতর নিযুক্ত করা চলে এমন সম্পদের সংস্থান হওয়া সম্ভব, তা থেকেই গড়পড়তি উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি। দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির গোড়ার কথা তাই নিবৃত্তি-দর্শন। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ এই দর্শনে সমাহিতির সঙ্গে কান পেতেছে। কিন্তু সে সমাহিতি যখন আর নেই, নতুনভাবে কী ক'রে তাহলে নিবৃত্তির ধর্ম প্রচার করা চলে?

এটা তাই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। নেতারা যতই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকুন না কেন, সে আশ্চর্য যুগ আর নেই যখন তাঁদের নিছক আহ্বানেই কাতারে কাতারে লোক প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে আসত; লোকের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা কমেছে, যে লক্ষ্যের কথা বলা হচ্ছে তার সম্বন্ধে

স্পষ্ট কোন ধারণাও তেমন নেই। অতএব প্রতীক্ষা প্রয়োজন; যে মানসিকতা না থাকলে দ্রুত প্রগতি সম্ভাব্যতার বাইরে তাকে সন্তর্পণে লালন করতে হবে, তাকে বাদ দিয়ে এগোতে গেলে পা পিছলে বিপর্যয় বাধ্যবারই আশঙ্কা।

এই মুখবন্ধটি স্বীকার ক'রে নিলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্রিয়াক্রমের অনেক কিছুই সহানুভূতির সঙ্গে দেখা চলে। সম্প্রতি অবশ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাবিষয়ক লেখালেখি ও বইপত্রের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে, কিন্তু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এ বিষয় সম্বন্ধে লোকের মনে মাত্র ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল। সোভিয়েট দেশে এ ধরনের পরিকল্পনা কেমন অদ্ভুত রূপান্তর এনে দিয়েছে, তা নিয়ে রূপকথাপ্রতিম জল্পনা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনার প্রত্যয়, গঠন, প্রণালী, ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে সামান্য চিন্তার সূত্রপাতও হয়নি। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামগুলো বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকাতেও যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি বিশেষ বিবর্ত সম্ভব, সে সম্বন্ধেও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। সবশেষে, দেশভাগের ফলে যে বিশৃঙ্খলা যাচ্ছিল, সব ছাপিয়ে খাদ্যদ্রব্যের অনটন, তা প্রায় অনুশাসন উচ্চারণ ক'রে গেল ঐ মুহূর্তে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আগে-পরের ব্যাপার কী ক'রে ঘোচাতে হবে, এবং প্রথম পরিকল্পনায় কোন্-কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পরিকল্পনায় যা তাই প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ছিল তা একটা অনুচ্চারিত বিনয়, পরিমিতিবোধ। দু'দিক দিয়েই বিনয় : লক্ষ্যের বিষয়ে, সেই সঙ্গে প্রকরণের ব্যাপারেও। লক্ষ্য ছিল খুবই সীমিত : পাঁচ বছরে জাতীয় উপার্জন শতকরা এগারো বিন্দু এগোবে, বিশেষ ক'রে চাল, গম, কার্পাস, পাট, চিনি এ রকম কৃষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্দিষ্ট কতগুলো হারে বাড়াতেই হবে; তা ছাড়া কয়েকটা বহু-উদ্দেশ্যিক বিদ্যুৎ-উদ্যোগের পত্তন, রেল এঞ্জিন ও চাষের সারের কারখানা, ছোটখাট নানা এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে উৎসাহদান, একটা ইস্পাতের কারখানা শুরু করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে প্রস্তাব। সেই সঙ্গে অবশ্য পল্লী উন্নয়নের জন্য অনেকপ্রকার ব্যবস্থা। প্রকরণের দিক থেকেও বলা চলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গঠন খুবই ঋজু, সহজ: জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সব-কিছু প্রভাবান্বিত করার কোন অভিলাষ নেই, ধনবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম সাম্প্রতিকতম সূত্রের মারফৎ জ্ঞান-কপচানো নেই, কার্যক্রমের তালিকাগুলোকে সামান্য একটু বিশ্লেষণের মালা পরিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, শুধুমাত্র যোগ করা হয়েছে পাঁচবছর শেষ হ'লে জাতীয় আয়ের চেহারা কেমন দাঁড়াবে, এবং সে অবস্থায় বিনিয়োগের হারই বা কেমন রূপ নেবে।

যেখানে লক্ষ্য উঁচু নয়, আশাভঙ্গের সম্ভাবনাও সেখানে কম। প্রথম পরিকল্পনা তাই মোটের উপর সফলই হয়েছে : কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে, তা সে পরিকল্পনা-ভুক্ত বহুবিধ উদ্যমের জন্যই হোক, কি সুমিত বৃষ্টির জন্যই হোক; শিল্পোৎপাদনও চমৎকার গতিতে অগ্রসর হয়েছে; এবং সব মিলিয়ে জাতীয় আয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে শতকরা এগারোর কিছু বেশিই বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যপক্ষে যেটা উল্লেখের কথা, বিনিয়োগের হার আপেক্ষিকভাবে বাড়েনি, এবং এ হার যথাশীঘ্র বাড়াতে না পারলে আচিরে প্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। বিভিন্ন শিল্পে পূর্ববর্তী বিনিয়োগের ফলে যেহেতু বাড়তি উৎপাদনক্ষমতা ছিল, সমকালীন বিনিয়োগ সুবিধাজনক না হওয়া সত্ত্বেও তাই প্রথম পরকল্পনায় জাতীয় আয় ব্যাহত হয়নি। কিন্তু নতুন পুঁজি খাটানো না হ'লে প্রাক্তন ক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে এ ধরনের উৎপাদন সম্প্রসারণ খুব বেশিদিন সম্ভব নয়। বিনিয়োগের হার অনড় হ'য়ে

দাঁড়িয়ে থেকেছে কারণ জাতীয় করের হার বাড়ানো যায়নি, অতএব প্রতিশ্রুত অনেক সরকারী উদ্যোগ হয় আরম্ভ করাই হয়নি নয়তো টিমে তালে এগিয়েছে; ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগ করার যে প্রস্তাব প্রথম দিকে হয়েছিল তাও শেষ পর্যন্ত প্রায় অনারব্ধ থেকেছে; এবং বেসরকারি মহলেও উদ্যোগের বিস্তার বাড়ানোর জন্য তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। শেষোক্ত শ্রেণীর মানসিকতা বুঝে ওঠা অবশ্য কঠিন নয়, জনমনে সাধারণত পরিকল্পনা বিষয়টির সমীকরণ হ'য়ে থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে; গণ্যমান্য অনেক ব্যবসায়ী সমর্থিত বোম্বাই পরিকল্পনার খসড়া সত্ত্বেও, অনেকে তাই নতুন উদ্যমে অঙ্গীকার করার আগে কয়েকটা বছর প্রতীক্ষারত থাকাই বুদ্ধিমত্তা ব'লে মনে করেছেন।

তা'হলেও প্রথম পরিকল্পনার পরোক্ষ শুভফল হয়েছে অনেকগুলো। উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির আতঙ্ক ঘুচে গেছে, কৃষির শ্রীবৃদ্ধির ফলে দুর্ভিক্ষের ছায়াও সরে গেছে। সর্বসাধারণের মনে একটা প্রত্যয় ও আস্থাশীলতার ভাব এসেছে। পল্লী উন্নয়নের হরেক-রকম কার্যক্রম থেকে গ্রামাঞ্চলের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তাৎক্ষণিক কোন উন্নতি যেখানে-যেখানে না-ও হয়েছে, সংযোগের সেতু অন্তত একটি স্থাপিত হয়েছে, পল্লীবাসীদের ঐতিহ্যগত অনীহা ও হতাশা দূরীকরণের জন্য অনেক নিরীক্ষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। যৌথব্যবস্থাতার জাদুকরী ক্ষমতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপকারিতা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা থেকেই পরিণামে অনেক লাভের সম্ভাবনা।

আসলে প্রথম পরিকল্পনার পাঁচবছরে এটাই সবচেয়ে মস্ত লাভ : যে আবহের কথা প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, যাকে বাদ দিয়ে জাতীয় অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয়, আস্তে আস্তে সেই পরিবেশ দেশে যেন গড়ে উঠছে। লোকসভা ও বিধানসভার আলোচনায়, সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়, নেতা ও মনীষীদের ভাষণে ফল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও যা বড়, লোকমানসে পরিকল্পনার শুভঙ্করিতা সম্বন্ধে প্রতীতি অভিজ্ঞতার উৎস থেকেই এসেছে। ছোট উদাহরণেও চমৎকার উপকার পাওয়া যায়, যদি তা সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে হরণ করতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার সীমা খুব স্বল্প হ'লেও লোকে তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় তার শুভতা অনুভব করছে, সেখানেই তাই সফলতা।

আর এক দিক দিয়েও মহৎ সমৃদ্ধি হয়েছে। লোকে ঠেকে শেখে, দেখে শেখে; অভিজ্ঞতা ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নেয়। গেলো পাঁচ-ছ বছরে পরিকল্পনার রূপ, গঠন, প্রকরণ ও বিবিধ সমস্যা নিয়ে দেশে এত বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে যে অনেক অস্পষ্টতা সরল হ'য়ে এসেছে। অনেক কুসংস্কার ঘুচেছে, সাধ্য ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে ধারণা আবেগের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হ'য়ে শুদ্ধ অন্বীক্ষার ঋজুতা পেয়েছে। চিন্তার এই বিস্তার ও ব্যাপ্তি শুধু যে পেশাদারী ধনবিজ্ঞানী ও সরকারী পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে ছড়িয়েছে তা নয়, ব্যবসায়ীমহল, সাধারণ কর্মজীবী, ছাত্র, শ্রমিক, এমনকি সাধারণ চাষী—সর্বশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সাধ্য, সিদ্ধি, প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপারে পরিমিতিমতো জ্ঞানপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিশেষ করে এ জ্ঞান যে উপর থেকে জোর ক'রে চাপানো হচ্ছে না, অন্তঃশীল আগ্রহেই—এবং নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে যাচাই ক'রে নিয়ে—যে লোকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূত্রগুলো শিখে নিচ্ছে, সে-লাভের তুলনা নেই।

অতএব এটা জোয়ারের সময়। যে উত্তাল উৎসাহবোধ জাতীয় অগ্রগতিকে এক ঝাপটায় অনেক যোজন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার সূচনা নিঃসন্দেহে দেখা দিয়েছে। এই চেতনার সুযোগ না নিলে আরো হয়তো অনেক বছর ধ'রে নতুন ক'রে অপেক্ষায় থাকতে

হবে। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয় এক দশমাংশের কিছু বেশি বেড়েছে, কিন্তু আমরা যে দৈন্যদশায় আছি, তা ঘোচাতে হ'লে এই বৃদ্ধির হার কিছুই নয়। পশ্চিমের সমৃদ্ধিশীল সব ক'টি দেশেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এর চেয়ে বেশি, সুতরাং আমাদের প্রগতি আরো দ্রুত না করতে পারলে আমরা তুলনায় ক্রমশ পিছিয়েই পড়বো। তজ্জনিত যে সমাজবিক্ষোভ একদিন অবশেষে বিস্ফোরণ হ'য়ে দেখা দেবার আশঙ্কা, তা এড়াতে হ'লে তাই যে ক'রেই হোক বর্তমান মুহূর্তে বিনিয়োগের হার টেনে উপরে তুলতে হবে। এখানেই ত্যাগস্বীকারের প্রশ্ন আসছে : সরকারকে কর এবং ধার দু'টোই অনেক বেশি ক'রে লোককে দিতে হবে, নইলে দ্রুত অবস্থা-পরিবর্তন সম্ভব নয়; তা ছাড়া কিছু পরিমাণ ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগ করলে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র যে একটু মহার্ঘ হ'য়ে উঠবে, সে ত্যাগও প্রসন্নহৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে। সরল বিবৃতির সাহায্যে লোকমনে এ-সত্যগুলো অনুপ্রবেশ করানো প্রয়োজন। প্রত্যেক জিনিসেরই জন্য একটা মূল্য দিতে হ'য়ে থাকে, জাতির দ্রুত শ্রীসম্পদবৃদ্ধি করতে হ'লে তার জন্য আপাতত যে দাম দেওয়ার তা-ও তাই দিতেই হবে। অধুনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়ে দেশে যে আগ্রহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় কল্পনা ও কুশলতার সঙ্গে দেশবাসীকে এ আহ্বান জানানো হ'লে প্রয়োজনানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবেই।

এই সিদ্ধান্তই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভূমিকা। পরিকল্পনাটির যাঁরা খসড়া করেছেন, প্রথম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের সাহস বেড়েছে, আশা বেড়েছে, প্রাকরণিক দক্ষতাও অনেকখানি এগিয়েছে। এবার লক্ষ্য আগামী পঞ্চবর্ষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ আরো এক চতুর্থাংশ বাড়িয়ে তোলা। যদিও কৃষির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট, শিল্পের ক্ষেত্রে—বিশেষ ক'রে বড় বড় কল-কব্জা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিমেণ্ট, সমস্ত কিছু খনিজ—বিনিয়োগ বহুগুণ বৃদ্ধির উপর প্রধান ঝোঁক গিয়ে পড়েছে। জাতীয় প্রগতির হার যেহেতু মূলত শিল্পের প্রসারের উপরেই বিশেষ ক'রে নির্ভরশীল, তাই এই ঝোঁক খুবই স্বাভাবিক ও সময়ানুগ। সেই সঙ্গে বড় বড় কারখানায় যেহেতু বেশি লোক খাটানো সম্ভব নয়, যাতে বেকার সমস্যা বেড়ে না চলে সেজন্য কুটিরশিল্প বিস্তারের জন্যও ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয়েছে। লোকমানসে আগ্রহ, এবার শুধু যদি প্রয়াস ক'রে একসঙ্গে অনেকগুলো কল-কারখানার শুরু ক'রে দেশে শিল্পসাধনার একটি ঘন আবহাওয়া সৃষ্টি করা চলে, তাহ'লে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেশের সম্পদ বেড়ে যাবে, ইয়ং-কথিত সেই potential indivisibility-র প্রসাদে আমরা বহুল লাভের অংশভাগী হবো।

ঘুরে-ফিরে একই কথাতে ফেরা তাহ'লে : সমস্যা হলো বিনিয়োগ বাড়ানো নিয়ে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হবে কিনা তা নিয়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রে বলা হয়েছে জাতীয় বিনিময়ের হার এ পাঁচবছরে শতকরা সাত থেকে শতকরা এগারোতে তুলতে হবে। সে সাফল্য নির্ভর করছে সম্মিলিতভাবে ধার, কর ও ঘাটতি অর্থনীতি প্রয়োগের কুশলতার উপর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লোকসম্মতি ছাড়া কোন কিছু সম্ভব নয়; বিনিয়োগের হার-বৃদ্ধিও তাই শেষ পর্যন্ত সাধারণের ছাড়পত্রের উপর নির্ভর করছে।

অনেকেই অবশ্য অসহিষ্ণু হ'য়ে ঘাড় নাড়বেন, এমন উক্তিও করা হবে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই পরিকল্পনাতেই ঝিমোনো-ঝিমোনো ভাব, জাতীয় আয় বাড়ার হার অপ্রতুল; উদাহরণ হয়তো দেওয়া হবে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিংবা পূর্ব ইউরোপের পরিকল্পনাগুলো থেকে উদ্ধৃত ক'রে : আমাদের প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ের যে উন্নতি

হয়েছে, এ সমস্ত কোনো কোনো দেশে সে হারে উন্নতি মাত্র একবছরে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনারচয়িতা যাঁরা, তাঁরা অতএব ভীরু, ভুবনের ভার তাঁদের হাতে নেই।

এ যুক্তির খণ্ডনে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, ধনবিজ্ঞানীদের কতগুলো শর্তের সীমায় সম্পাদ্যের খসড়া তৈরি করতে হয়, তাদের মধ্যে প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামো। রাজনৈতিক সংস্থার বাইরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে দাঁড় করানো অসম্ভব। পূর্ব ইউরোপে যে হারে জাতীয় আয়ের উন্নতি হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে শতকরা ২০ থেকে ৩০ পর্যন্ত বিনিয়োগ হার, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান হারের তিন-চারগুণ বেশি। নিবৃত্তির পরিমাণের সঙ্গে তাই জাতীয় আয়ের অগ্রগতির হার অঙ্গাঙ্গী বাঁধা। উল্লিখিত দেশগুলোতে যে-যে প্রকরণের সাহায্যে এই উঁচু মানের নিবৃত্তি নির্ধারণ ও নিয়োগ করা হয়েছে, তা আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সংস্থার অতএব পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া পরিকল্পনার যাঁরা খসড়া করেছেন, তাঁদের দায়িত্বের বাইরে। তাছাড়াও অবশ্য বলা চলে, জাতীয় আয়বৃদ্ধি এসমস্ত দেশে যে-বিশেষ রূপ নিয়েছে, সে-সম্বন্ধে অনেকের মনে আপত্তি ওঠা সম্ভব।

চলচ্চিত্র

কাবুলীওয়ালা—তপন সিংহ

শিক্ষিত লোকের মুখে চলচ্চিত্রের আলোচনায় 'বক্স অফিস'-এর প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রায় অবধারিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এতে দেশপ্রাণতা বা আর্টপ্রাণতার সবিশেষ প্রমাণ থাকতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে চলচ্চিত্রের চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং জনসাধারণের প্রতি একটি হিতাকাঙ্ক্ষী অবজ্ঞা। কেননা জনপ্রিয়তা ছাড়া চলচ্চিত্রের গতি নেই, তার প্রকান্ড প্রকরণ বক্স-অফিসের নির্ভরেই চলে—শুধু মার্কিণ দেশে বা এদেশে নয়, সব দেশেই। এমন কি কোন সাম্যবাদী সরকারও চিরকাল বক্স-অফিস সম্বন্ধে বেপরোয়া হ'য়ে চলচ্চিত্রের মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে পারে না। তা' ছাড়া কোন ছবি, তা' যতই গর্হিত শিল্পকর্ম হোক না কেন—যদি জনপ্রিয় হয় তা'হলে বুঝতে হবে যে তাতে জনসাধারণের কোন না কোন পিপাসা মিটছে। পিপাসা সর্বদাই স্বাস্থ্যকর, যদিও তাকে মেটাবার উপায়ের ভেদ আছে। অনেক ধরনের পানীয় বিশেষ ক্ষতিকর। চলচ্চিত্রের উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত তার সবচেয়ে বড় সমস্যা—লোকে কী চায়। যাট বছরের মধ্যে এর কোন নির্ভরযোগ্য উত্তর পাওয়া যায়নি। কোন ফর্মুলাতে বক্স-অফিস এখনো বাঁধা পড়েনি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই চলচ্চিত্রের সব চেয়ে বড় উৎসাহ, বৃহত্তম সম্ভাবনা। বক্স-অফিসকে (অর্থাৎ জনসাধারণকে) এড়িয়ে চলচ্চিত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তার চৌকাঠ পেরিয়ে তবেই চলচ্চিত্রের রাজপথ আরম্ভ, বৃহৎ শিল্পকর্মের গোড়াপত্তন। চ্যাপলিন, যাঁকে বার্নার্ড শ বলেছেন 'চলচ্চিত্রের একমাত্র শিল্পী'—তাঁর সমস্ত শিল্পরীতিকে জনপ্রিয়তার ভিত্তিতেই দাঁড় করিয়েছেন। এই স্তরে পোঁছে জনপ্রিয়তাকে বলা যেতে পারে বিশ্বজনীনতা। আরো অনেকে বিভিন্ন স্তরে এই মহৎ জনপ্রিয়তাকে আয়ত্ত করেছেন। আজকের যুগে চলচ্চিত্রই একমাত্র শিল্প যা এই জনপ্রিয়তা বা বিশ্বজনীনতা অর্জন করতে পারে। এই সমস্ত স্তরে পোঁছবার ক্ষমতা যাঁরা রাখেন না তাঁরাই চলচ্চিত্রকেও মুষ্টিমেয়ের শিল্পে পরিণত করতে চান। তাঁদের মতে যা জনসাধারণের বোধগম্য নয় তাই শিল্প। আমাদের দেশেও মহৎ জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত আছে—যেমন 'পথের পাঁচালী'। কাজেই চলচ্চিত্রের যাঁরা অনুরাগী, বক্স-অফিসের প্রতি তাঁদের একটি আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব থাকা দরকার।

একই সঙ্গে 'কাবুলীওয়ালা'র নাম-ডাক ও ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে আশা হয়েছিল এখানেও বুঝি উন্নত ধরনের জনপ্রিয়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। কিন্তু দেখা গেল ক্ষমতাবান কুশলী শিল্পী হয়েও নবাগত তপন সিংহ বাংলার বক্স-অফিসের শেষ ভরসা অর্থাৎ আঁখিজলকেই আশ্রয় করেছেন। কাতুকুতু দিয়ে হাসানো আর বেঁধে মার দিয়ে কাঁদানো একই কথা। 'কাবুলীওয়ালা' দেখে চোখে জল আসে, এটা শারীরিক সত্যও হ'তে পারে, কিন্তু তার কোন শিল্পগত অর্থ নেই। কাঁদাতে পারা বা হাসাতে পারা শিল্পেও হ'তে পারে, আবার সার্কাসের বাহাদুরীও হ'তে পারে।

এই বাহাদুরীতে তপন সিংহকে বাহবা দিতে হয়, কেননা অতি যত্নে এবং কৌশলে তিনি কান্নাকে যে-ভাবে দমকে দমকে তৈরী করেছেন, তার নিপুণতার তুলনা ইদানীং দেখা যায়নি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটা একনিষ্ঠ অনন্যমনতা আছে। তা'ছাড়া তিনি চিত্রনাট্য, দৃশ্য-রচনা ও সংলাপে, অভিনয়ের পরিচালনায়, ক্যামেরার কোণ নির্ণয়ে, বাস্তবতার অনুকরণে নবাগত হ'য়েও যা ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাতে বহু প্রবীণ বাঙালী পরিচালককে লজ্জা দেবে। রহমৎ-এর কলকাতার আস্তানাটি রীতিমতো বাস্তব এবং আমার মনে হয় সেখানকার ঘটনাবলীতেই তপন সিংহের ক্ষমতার সব চেয়ে ভালো পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তা' ছাড়াও মিনির বাড়ি, মুদির দোকান, ধারের খদ্দেরের বাড়ি ইত্যাদিতে ভূগোলজ্ঞান দেখতে পাওয়া যায়। একমাত্র মিনির বিয়ের দিন স্বামী-স্ত্রীর বসে কাঁদুনি গাওয়ার বিসদৃশ্যতা ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যে সংলাপও জোরালো। প্রস্তাবনার অধ্যায় অতি দীর্ঘ হ'লেও তার বাঁধুনি ভালো, আর এত সুদৃশ্য নাটকীয় স্বীকৃতিপর্যায় (title-sequence)-ও বোধ হয় আজ পর্যন্ত বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি। জেলের দৃশ্যের অন্য যত দোষই থাক, খানিকটা বাস্তবতা আছে। মোটামুটি ছবির কোন পর্যায়েই দৃশ্য রচনার দিক থেকে অবিশ্বাস্য নয়। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্ণয় পরিচালনার অন্যতম কঠিন কাজ, তাতেও মহৎ কল্পনা যেমন নেই, তেমনি কষ্টকল্পনা নেই, বিসদৃশ্যতা বা অর্থহীনতা নেই। জেলের অন্ধকার থেকে

রহমৎ যখন প্রখর রোদে বেরিয়ে আসে তখন তাকে দেখার ভঙ্গিতে যথাযথতা আছে, যদিও আরো বহুদূর থেকে দেখলে দৃশ্যের ব্যঞ্জনা আরো বেশি পাওয়া যেত।

টিঙ্কু ঠাকুরের ও ছবি বিশ্বাসের অভিনয় এই ছবির মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। টিঙ্কুর নির্লিপ্ত মুখের সঙ্গে তার চমকপ্রদ কথার বেশ একটি টানাপোড়েন আছে, যদিও কোথাও কোথাও কথাগুলি অতি বিজ্ঞতার পর্যায়ে পড়ে। কিছু কম কথা, কিছু নীরবতা থাকলে কাবুলীওয়ালার সঙ্গে তার মনের মিলটা আরো বাস্তব হত। ছবি বিশ্বাসকে কোথাও সেই কাবুলীওয়ালা ব'লে ভুল হয় না যাকে দেখে ঝি ব'লে ওঠে 'সব্বনাশ হয়েচে, সেই কাবলেটা আবার এয়েচে'। এ 'কাব্‌লে'র মুখে সর্বদাই একটি স্বর্গীয় ভাব লেগে রয়েছে, হিং-এর ব্যবসাটা তার একটি মুদ্রাদোষ মাত্র। হাঁটা-চলার মধ্যে বেশ বাঙালী 'সাহেব-বিবি-গোলাম'-এর মেজবাবু উঁকি দেয়। এ কাবুলী কাবুলী নয়, মেজবাবু নিশ্চয়! কিন্তু বলতেই হবে যে হাঁটা-চলায় একেবারে কাবুলী না বনে গেলেও ছবি বিশ্বাস একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যার অঙ্গভঙ্গী, কথাবার্তা, হাবভাবের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা ও বিশ্বাস্যতা আছে।

কিন্তু এই সব গুণ নির্গুণ হ'য়ে যায় পরিচালকের অবাস্তব একপেশেমির জন্য। ঘটনা যাই হোক, জীবনের চরিত্র দেখানোই যে কোন শিল্পের উদ্দেশ্য। জীবনের সব ঘটনাই যদি একপথে চলতে সুরু করে তবে তার বাস্তবরূপ লোপ পায়। কাবুলীওয়ালার জীবনে তার মেয়ে ছাড়া যেন কেউ নেই, স্ত্রী নেই, বন্ধু নেই, অন্য কোন স্মৃতি নেই। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু তার কোন পরিণতি হয় না, কেবল মেয়ের বুকের ছাপ আঁকড়ে সে পড়ে থাকে। মিনি খুকী থেকে বিয়ের কনে হ'য়ে যায়, কিন্তু কাবুলীওয়ালা যেমন ছিল তেমনই থাকে। আট বছরের ঘটনাকে আটদিনের অনন্যতার স্তরে এনে ফেলে তাকে বাস্তবতার মুখোস পরিয়ে লাভ কী? জেলে কাবুলীওয়ালার সঙ্গী ডুকরে কেঁদে ওঠে, কারণ তার ছোট মেয়ে মারা গেছে (ছেলে মারা গেলে কাবুলীর প্রাণে দুঃখ হতো না), জেলের কর্তাব্যক্তিরও এক মেয়ে, একই বয়সী। এই রকম একটা অবিশ্বাস্য, প্রায় পৌরাণিক একনিষ্ঠতা কেবল মেলোড্রামা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। জীবনের ভরাট, ত্রিমাত্রিক, চারিদিককার রূপ হারিয়ে যায়। জীবনের যে একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ অমোঘ ও নিজস্ব গতি এবং চরিত্র আছে তাতেই ব্যক্তির অবস্থাকে ট্র্যাজিক বা কমিক ক'রে তোলে। শুধু সেই ব্যক্তি এবং তার দুঃখকষ্টের অপেক্ষায়ই যদি জীবনকে বিবৃত করা হয়, তাহলে তাতে বেঁধে মার দেওয়ার কান্না জুড়তে আপত্তি নেই, কিন্তু সে কান্না দর্শক প্রেক্ষাগৃহেই রেখে আসে, সঙ্গে নিয়ে যায় না, যেমন নিয়ে যায় না কাতুকুতু-দেওয়া হাসিকে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা'র রস একান্তভাবে ছোটগল্পের, তা থেকে এপিক বা মেলোড্রামা হয় না। তার করুণরসের একটুখানি মধুর আমেজ বাস্তব-অবাস্তবের মাঝখানের ক্ষুরধার পথ দিয়ে অবলীলাক্রমে নিয়ে আসে, মনে রেশ রেখে যায়, কিন্তু প্রলয় বাধায় না। সেই গল্পকে কান্নার গ্রন্থি হিসাবে ব্যবহার ক'রে সিদ্ধহস্তে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরা মোটেই শিল্পকর্ম নয়।

অতএব জনপ্রিয়তা দু'রকমের—একটি সহজলভ্য, আরেকটির পথ অতি ক্ষুরধার।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

'অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা'—এই ছত্রটিতে এ যুগের তরুণ যৌবনের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত। সেই রূপটির স্বরূপ স্বীকার না করিয়া লইলে এ যুগের নবীন কবিদের কাব্য বুঝিয়া ওঠা বোধ করি সম্ভব নয়। সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মনে উত্তরার মূর্তি নিশ্চয় বারংবার অন্তিম চেতনার বিদ্যুতবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতকার বলেন যে অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া বীর যুবক মাতুল কৃষ্ণ ও পিতা ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিয়াছিল। কিন্তু মহাভারতকারের সাক্ষ্য ছাড়াও বিশ্বাস করিতে বাধা নাই যে মাতুল ও পিতার চেয়ে কম মনে পড়ে নাই জনশূন্য প্রাসাদের অলিন্দ সলগ্না প্রতীক্ষমানা উত্তরাকে। আর সেই শেষ মুহূর্তের পরমবেদনার শিখায় উত্তরার মূর্তিতে এমন কিছু অভিমন্যুর চোখে পড়িয়াছিল নর্ম রজনীর সহস্র দীপালোক যাহা ধরা পড়ে নাই। মহাভারতকার সে কাহিনী না লিখিয়া থাকুন, এ যুগের তরুণ কবিরা প্রেম অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া সেই বিস্মৃত বেদনা কাব্যে লিখিতেছেন। এ যুগের তরুণ কবি সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমন্যু, উত্তরা তাহার মানস প্রতিমা, প্রেম কাব্য সেই অন্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা।

সম্প্রতিকালে লিখিত নবীন কবিদের প্রেমের কবিতা পড়িয়া এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে একজন নবীন কবির কাব্যে ঐ ছত্রটি পাইলাম, মনে মনে বলিলাম যাঁহাদের ব্যথা তাঁহারাই ভাষা দিয়াছেন, আমার দায় অনেক কমিয়া গেল।*

গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত নবীন কবিদের কাব্য পড়িবার সুযোগ আমার হইয়াছে। এই সব কবিতায় অধিকাংশই আমার কাছে হৃদ্য মনে হইয়াছে আর সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে গত ২৫।৩০ বছর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বা সাম্প্রতিক কাব্য নামে যে কুজ্ঝটিকা জমিয়া উঠিতেছিল নবীন কবিগণ অনেকাংশে সেই অকাব্যের কুহেলিকা হইতে মুক্ত। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ইঁহাদের কাব্যের মৌলিক প্রেরণা ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা, সমাজ ও সংসার মানুষের চারিদিকে যে দুর্মোচ্য জাল বুনিয়া তুলিতেছে তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস; কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা কোন আলঙ্কারিক প্যাটার্ন বা ছাঁচের কৃত্রিম প্রেরণা এই সব কাব্যকে উদ্বোধিত করে নাই। কি বিষয় নির্বাচনে, কি শব্দ চয়নে, কি প্রকাশের বাহন সংগ্রহে ইঁহারা অন্তরের প্রেরণার কর্তৃত্বকে

* অমৃত-যন্ত্রণা—সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা। প্রণব ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী, শীতল চৌধুরী, শিশিরকুমার দাশ, সুকুমার ঘোষ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, পরিমল সরকার, প্রণয়-কুমার কুণ্ডু, নির্মলেন্দু বিকু, অতন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুধীর চক্রবর্তী-র প্রেমের কবিতার সঙ্কলন।
জন্মলগ্ন—শিশিরকুমার দাশ। সিগনেট বুক শপ। মূল্য দু টাকা।

স্বীকার করিয়াছেন, বাহিরের কোন প্রেরণার ইঙ্গিতকে নয়। আর সেইজন্যই এসব কাব্য অনর্থক দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই শিল্পকলার আধুনিকতম পরিণতি বলিয়া ঘোষণা করে নাই। আরও একটি কথা। এইসব কবি গোষ্ঠীমৈত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়াও ভাবের একটি অখণ্ড আবহাওয়ার মধ্যে যেন সঞ্চরণ করিতেছেন। বর্তমান কাব্য সঙ্কলনগ্রন্থ "অমৃত যন্ত্রণা" এই সব গুণের ও লক্ষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২

"অমৃত যন্ত্রণা"র প্রায় সকল কবিই এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—দু' একজন মাত্র সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। কাজেই ইঁহাদের গড় বয়স ২০।২২ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সুতরুণ বয়সে কাব্য প্রেরণার কাছে আত্মসমর্পন যথার্থ কবি প্রকৃতির পরিচায়ক। পূর্বতন কালে যে-সব গুণ (দোষও একটা গুণ) শিল্প কৌশলের চরম বলিয়া করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হইত তেমনি একটিও 'ব্যাসকূট' বা প্যাঁচ কাব্যখানিতে চোখে পড়িল না। কবিতা কুণ্ডলের মতো কর্ণগ্রাহী—শ্রুতি মাত্রে কানে লাগিয়া থাকে।

(১) অরণ্য তোমার মন, বৃষ্টি হোক আমার হৃদয়
(২) যন্ত্রণাও যথী হয়
(৩) রেখে যাবো বয়সের বুক ভরা বাসন্তী প্রণাম
(৪) সে বুঝি মেঘের মেয়ে, রোজ তাই মেঘ দেখে তার
ব্যথার অসহ্য ছায়া মুখে পড়ে।

কিম্বা প্রবন্ধারম্ভে যে ছত্রটি উদ্ধার করিয়াছি—

অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা।

এ সব মোহময়, ধ্বনিময় ছত্র মনে রাখিবার পক্ষে একবার শোনাই যথেষ্ট।

২৫।৩০ বছরের পূর্বতন কবিরা অকৃপণ হাতে কাব্যের মাঝে মাঝে বিদেশী শব্দের পাথরের টুকরা ছড়াইয়া দিতেন; পাঠকের মনোরথ হুঁচোট খাইয়া উচ্চকিত হইয়া উঠিত; শুনিত সেটাই নাকি আধুনিক কাব্য শিল্পের বাহাদুরি। সে-সব কবি স্বীকার না করিলেও কথাটা সর্বজনস্বীকৃত যে শব্দ তাহার অদৃশ্য ভাবমণ্ডলের দ্বারা রসোদ্বোধনে সাহায্য করে, কেবল অর্থের দ্বারা নয়। উর্বশী শব্দকে ঘিরিয়া দীর্ঘকালে যে ভাবমণ্ডল জমিয়া উঠিয়াছে, উর্বশীর সৌন্দর্যের চেয়েও কাব্যের পক্ষে তাহার মূল্য বেশি। কিন্তু 'আর্টেমিস' শব্দটির সঙ্গে ভারতীয় তথা বাঙালী পাঠকের তেমন রসের অনিবার্য যোগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া কাব্যে শব্দটি নিরর্থক। কিন্তু, না, ঐখানেই নাকি কবিতা ভাবমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয় "অমৃত যন্ত্রণা"য় ঐ রকম একটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ দেখিলাম। কবি বলিতেছেন—"সমুদ্র-নীল মিশরীয় চোখ তুলে।" 'মিশরীয়' চোখ বলিতে কবি কি দেখাইতে চান তাঁহার কাছে বোধ করি তাহা স্পষ্ট নয়—পাঠকের কাছে তো নয়ই। কেন না, মিশরীয় সাহিত্য বা জীবনের সঙ্গে যে সুদীর্ঘ আত্মীয়তার যোগ স্থাপিত হইলে—মিশর সংক্রান্ত একটি শব্দ পাঠকের মনের উপরে জাদুদণ্ডের ক্রিয়া করে—এখানে সেই অনিবার্য আত্মার যোগ কোথায়? ইংরেজ কবি যখন বলেন—O Attic shape! তখন শব্দটি পাঠকের মনে জাদুরাজ্য গড়িয়া তোলে, কারণ প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কাব্য সমস্ত ইউরোপীয় চিত্তে বহুকাল ধরিয়া একটি মোহময় সৌন্দর্যময় ভূমিকা গড়িয়া

রাখিয়াছে। একটি মাত্র শব্দের টোকা মারিয়া কবি সেই পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া তোলেন। আবার বাঙালী কবি যখন বলেন, 'মালবিকা অনিমিষে চেয়েছিল পথের দিকে' তখন শ্রুতিমাত্রে আমাদের মনে বর্ষণঘন নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরের একটি ব্যাকুল মূর্তি জাগিয়া ওঠে। কালিদাস, উজ্জয়িনী, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ভূমিকা তৈরি করিয়া রাখিয়াছে, বাঙালী কবি তাহার সাহায্য লইলেন মাত্র। কিন্তু মিশরীয় চোখ বলিতে তেমন কোন অনিবার্য ভাবোদয় বাঙালী পাঠকের মনে হয় না।

৩

"অমৃত যন্ত্রণা"র কবিতাগুলিকে একটি অখণ্ড কবিতাগুচ্ছরূপে পড়িলে অন্যায় হয় না, কারণ এগুলির ভাবপরিমণ্ডল ও বিষয় এক। তরুণ প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাহন এই কবিতাগুলি।

প্রণব ঘোষের 'অরণ্য তোমার মন, বৃষ্টি হোক আমার হৃদয়' কবিতাটি উচ্চারণের শিল্প। এখানে দেখি প্রণয়িনীর স্মৃতির টানে মনোরম নিসর্গ দৃশ্যের স্মৃতি কবির জাগিয়াছে। প্রেমের সহিত প্রকৃতির রহস্যময় এই যোগাযোগ—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'ঘর' কবিতাটিতে, তরুণ সান্যালের 'নদী সমুদ্রের কথা'য়, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্রলম্ভে', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সে বুঝি মেঘের মেয়ে' কবিতায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'এই বাদাম গাছের ছায়ায়', তারাপদ রায়ের 'কশ্চিৎ কান্তায়, পরিমল সরকারের 'সূর্যমুখী শিখা' ও প্রণয়কুমার কুণ্ডুর 'ভূমিকা' কবিতায় আছে। কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সমস্ত মহাকবির প্রেম-কাব্যেই এই অভিনব যোগাযোগ বর্তমান। কিন্তু কারণটা কি? 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।' মনে তো পড়িল, কিন্তু এমন বিচিত্র সাম্য মনে পড়ে কেন? প্রেম ও প্রকৃতির মধ্যে পূর্বস্থাপিত একটা গোপন চলাচলের পথ আছে কি? কারণ যাহাই হোক এ যোগাযোগ যে কেবল উপমা সৃষ্টির খাতিরে বা সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। নবীন কবিগণ সেই চিরন্তন যোগটি অনুভব করিয়াছেন—উহা বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ আশার কথা।

প্রেমের চিরন্তন রহস্য কবিদের অনেককে জিজ্ঞাসাকাতর করিয়া তুলিয়াছে—

'দেহ মনের গোঁজামিলে
বিরোধী দুই চাওয়ায়, তুই কী দিবি তবু নারী।'

প্রেমানুভূতি একাধারে বিচিত্র অনুভূতি টানিয়া আনে, খেদ, শঙ্কা, ও ভীরুতা প্রেমের চিরসঙ্গী।

'ভয় পাই, যখন ভাবি, সে আমার জীবনে আসবে না।'

আবার—

'যে কাছে আসবে না কভু, সে কেন আমারে ভালবাসে।'

'এই বাদাম গাছের ছায়ায়' এবং 'তাকে' কবিতা দুটিতে প্রেমের এই শঙ্কাময় অনির্বচনীয়তা পরিস্ফুট।

প্রেমের ছলনার একটি মনোরম অভিব্যক্তি 'তুমি চলে গেছ বলে' কবিতাটিতে। আর প্রেমের প্রশান্ত বিষাদ অল্প বিস্তর অনেক কবিতাতে থাকিলেও, 'বাংলা দেশ' কবিতাটিতে তার অনবদ্য প্রকাশ।

কবিতাগুচ্ছটি পর্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা হইল যে তরুণ প্রেমের অনেক অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ, কেবল একটি ছাড়া। তরুণ প্রেমে দেহ মনের যে উল্লাস অনুভূত হয়, যে উল্লাস ছন্দ, ভাব ও ভাষার কোটালের বন্যায় আত্মপ্রকাশ করে তাহার যেন অভাব দেখিলাম। "অমৃত যন্ত্রণা"র কবিতাগুলি যদি কবিদের প্রেম কবিতার সাকুল্য সূচী হয় তবে এই অভাব লক্ষণীয়। তরুণ প্রেমে উল্লাসের অভাবের কারণ কি? প্রারম্ভে ঐ যে ছত্রটি উদ্ধার করিয়া দিয়াছি—

'অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী-চিন্তা দিয়ে ঘেরা'

—তাহাই কি কারণ? যুগচিন্তার ভারে তারুণ্য স্বধর্ম হারাইয়াছে—ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে? এ বিচারের ক্ষেত্র বিস্তৃত, কয়েকটি মাত্র কবিতার সূত্রে বিচারে নামিলে ভুল করিবার আশঙ্কা। তবে একথা সত্য—সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মনে উত্তরার যে ছবি জাগিয়াছিল তাহা বিলাসিনী উত্তরার ছবি নয়, প্রশান্ত বিষাদিনী উত্তরার ছবি—সে ছবি আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথা ও দুর্লভ মিলনের স্মৃতির পটে দৃষ্ট, কাজেই তাহাতে আর যাহাই থাকুক উল্লাস ছিল না নিশ্চয়। অনুরূপ অবস্থায় এ যুগেই বা থাকিবে কিরূপে?

এই সঙ্কলনগ্রন্থের শীতল চৌধুরীর 'ঝিনুকের দেশে' কবিতাটি বিস্ময়কর শিল্প-সৃষ্টি, যে-কোন সঙ্কলনগ্রন্থের গৌরব।

সারাদিন সমুদ্দুরের পারে
ঝিনুক খুঁজেছি তোমারি জন্যে,
সমুদ্র দেখার সময় তো পাইনি কোনদিন।

প্রেমের অপার রহস্যের কাছে সমুদ্র এখানে অকিঞ্চিৎকর, এমন অকিঞ্চিৎকর যে তাহা চোখেই পড়িল না।

নবীন কবিগণ এখানে নিতান্ত তরুণ—কাব্যজীবনের প্রারম্ভে বলিলে ভুল হয় না। তাঁহাদের কাব্য দুদশ বছর পরে কোন্ মূর্তি গ্রহণ করিবে এখন ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভরসায় বর্তমান হারাইতে রাজি নই, তাই তাঁহাদের কাব্যের প্রাতঃসূর্য রুচিকে অভিনন্দিত করিয়াই এখানকার মতো ক্ষান্ত হইলাম।

"জন্মলগ্ন" কাব্যের কবি শিশিরকুমার দাশ বয়সে তরুণ, এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। (ইঁহার কবিতা অমৃত যন্ত্রণা সঙ্কলনে আছে।) কিন্তু বয়সে তরুণ হইলেও "জন্মলগ্নে"র কবিতাগুলিতে এমন একটা চিন্তাগূঢ় রহস্য আছে যাহা সত্যই বিস্ময়কর। ইহার ভালোর দিকও আছে মন্দর দিকও আছে। ভালোর দিক, এই যে intellect কাব্য শিল্পের ছাঁচে ঢালাই হইয়া যথার্থ intellectual কাব্যসৃষ্টি করিতে পারে। মন্দর দিক এই যে অল্প-বয়সে অনুভূত ধীর গাম্ভীর্য শেষ পর্যন্ত কবিকে morbid করিয়া তুলিতে পারে। তবে সে আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়, কেননা ঐ সম্ভাবিত morbidity-র প্রতিষেধক "জন্মলগ্ন" কাব্যগ্রন্থখানিতেই বর্তমান।

একটি প্রতিষেধক কবিমনের লিরিক উচ্ছ্বাস—

কে আমাকে সন্ধ্যাবেলা মধুর চুম্বনে
বাজাবি, বাজাবি বল, কে আমাকে
গোধূলির ছায়ানীলে কে তার অঙ্গনে
বাজাবি, বাজাবি বল, কে আমাকে
নিয়ে যাবি, চাবি ভেঙে তোদের কুটিরে

শঙ্খকন্যা কেঁদে মরে সমুদ্রের তীরে॥

কিম্বা—

পাখি শুধু কেঁদে বলে : চোখ গেল চোখ গেল
আমি শুধু শুনে ভাবি তারপর।
আকাশে হিমেল হাওয়া ভেসে যায়
সারারাত, সারাদিন কান্নায়
পাখি শুধু ভরে দেয় সারা ঘর।

আর একটি প্রতিষেধক—সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটির প্রতি কবির আকর্ষণ ও আসক্তি—

আমার মৃত্যুর শেষে তোমার শ্রাবণ-মেঘময়
চুলের আঁধার ঘন ঘিরে দেবে পথের দুপার,
তোমার কাজল চোখ, আকাশের অপার বিস্তার
ব্যর্থ কি হবে না বলো;

কিম্বা—

চম্পকের গন্ধে পূর্ণ উদ্বেলিত দক্ষিণ সমীর

আবার কোন কোন কবিতায় ঐ দুটি প্রতিষেধক মিলিতরূপে প্রকাশিত—

হৃদয় ভরা উছল নদীর চারপাশে আজ বাঁধ
দেখতে পেলাম, হায়রে তাকে, দেখতে পেলাম না তো
সে আকাশে উঠল হয়ে প্রতিপদের চাঁদ
একটি করুণ গানের মতো আমার হৃদয়জাত।

আশা করা যায় যে এই দুটি গুণ, যাহা morbidity-র প্রতিষেধক আখ্যাত হইয়াছে কবির প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। আর শেষ পর্যন্ত ইহারাই যে কবি প্রতিভার নিয়ামক হইয়া উঠিবে না তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বর্তমান কাব্যে কবির শক্তির দুই কোটিতে টানাটানি চলিতেছে—একদিকে মৃত্যুলগ্ন, জন্মলগ্ন, লগ্নশেষ প্রভৃতি কবিতা, আর একদিকে—শঙ্খকন্যা, দিন আর রাত্রি, নানা রঙের দিনগুলি, জলাঙ্গী প্রভৃতির মতো কবিতা। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানাটানির ফল—"জন্মলগ্ন" কাব্য। এখন, ভবিষ্যতে কোনটি প্রবলতর হইবে বা দুটিতে মিলিয়া তৃতীয় একটি অভিনব ধারার সৃষ্টি হইবে তাহা বলা সহজ নয়।

প্রমথনাথ বিশী

সমালোচনা

Syamali—Rabindranath Tagore. Translated from the original Bengali *By* Sheila Chatterjee. Visva-Bharati. Calcutta. Rs. 5/-.

রবীন্দ্ররচনার যে সব সাম্প্রতিক অনুবাদ বিশ্বভারতীর তরফ থেকে প্রকাশিত হয় তার বেশির-ভাগই নৈরাশ্যজনক। এর জন্যে বিশ্বভারতীকে নির্বিচারে দোষ দেয়া অন্যায় হবে। কবিতার যথার্থ অনুবাদ এমনিতেই প্রায় অসম্ভব। যে ভাষায় অনুবাদ তার সঙ্গে যদি মূল ভাষার চরিত্রগত মিল না থাকে তা হলে অনুবাদে মূলের অর্থ ও ব্যঞ্জনা প্রায়শঃই বিকৃত হয়ে যায়। বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের এই প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি কবিতায় অভ্যস্ত পাঠকের ব্যবধান এত বেড়ে গিয়েছে যে রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদ আরো দুরূহ হ'য়ে উঠেছে।

স্থানকালনির্ভর রুচি ও মূল্যবোধের প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে বৃহত্তর রসিকসমাজে রবীন্দ্রনাথের কবিতার গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই অনুবাদের প্রেরণা। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সফল করতে হলে প্রথমত অনুবাদের বিষয়বস্তু বিশেষ বিচার করে নির্বাচন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার আবেদন secondary graces-এর সঙ্গে জড়িত। Secondary graces ভাবেরও হতে পারে, কারুশিল্পেরও হতে পারে। এই ধরনের আবেদন স্থানকাল দ্বারা এমনভাবে সীমাবদ্ধ যে বিদেশী ভাষার জগতে একে অনেক সময় হাস্যকর লাগে। দ্বিতীয় সমস্যা অনুবাদের যোগ্যতা নিয়ে। মূল অর্থ বা ভাব বিকৃত হবে না, অথচ ভাষান্তরেও তাকে খাপছাড়া, অস্বাভাবিক বা তুচ্ছ মনে হবে না—কবিতার অনুবাদে এই দুদিক বাঁচানো যে কী দুরূহ সে কথা যিনি এ চেষ্টা করেছেন তিনিই জানেন।

"শ্যামলী"র অনুবাদে এই সব বিবেচনা স্থান পেয়েছে এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত "শ্যামলী"-র অধিকাংশ কবিতার আবেদন বাঙালী পাঠকের বিশেষভাবে অভ্যস্ত পরিবেশ ও অনুভবের সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতার যে অলঙ্কারশূন্য শক্তি ও তীব্রতা তা এদের নেই—অথচ পূর্বপর্যায়ের দ্বিধাহীন আবেগ-ও অনুপস্থিত। এরা শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি—অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে। কাজেই এদের নিজেদের ভার কম।

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপ্সা-হ'য়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হ'য়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,

সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

অনুবাদে এই অল্পমধুর, অল্পকরুণ ভাবটিকে ধরে রাখা কঠিন। রাখতে পারলেও নতুন পরিবেশে তার মূল্য বেশি হবে না। ধরুন অভিমানের এই মৃদু অভিযোগ—

"এটুকু দরদের সরু বুননিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।"

বাংলাভাষায় এমন অভিযোগে বাঙালী পাঠকের প্রায় চোখ ভিজে উঠবে। কিন্তু ইংরেজিতে যখন পড়ি,

"The tiny knot tied by the fine web of that much consideration,
Would even that have been too much for you to bear?"

তখন বিদ্রূপমাত্র ভাবোদ্রেকের সম্ভাবনা-ও দেখি না। এর চেয়ে ভালো অনুবাদ নিশ্চয়ই করা সম্ভব ছিলো, কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু ফল হতো না।

যে সব কবিতা অনুবাদেও মূল্যবান মনে হ'তে পারতো অনুবাদের অক্ষমতার ফলে তাদেরও দুর্বল বা অদ্ভুত মনে হয়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ, কিন্তু কবিতার কান বা ইংরেজিভাষার কান কোনোটাই তাঁর নেই। "শেষ পহরে" কবিতাটাই ধরুন।

"Silence everywhere
Like that of a bird's nest bereft of birds
On the bough of a songless tree."

এটা কবিতা নয়, ইংরেজি কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অথবা ধরুন,

"Today my light consciousness has spread itself
Like a nebula in a dark moonless sky."

কিংবা

"The shot silk of memory and oblivion, both without anguish,
Forming all together a dream picture with face turned away
Like a piqued woman with a veil drawn over her."

এই ধরনের অনুবাদ বিশেষ পীড়াদায়ক। অনুবাদকে "কাব্য" করার চেষ্টায় শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় "vigil", "hapless me", "the eternal knots of wedded love", "portals of beauty" জাতীয় যে ধরনের কথা মাঝে মাঝে প্রয়োগ করেছেন সেগুলি প্রায় অসহ্য। বিবৃতিমূলক বা হাল্‌কা দু'একটি কবিতার অনুবাদ মোটামুটি সুখপাঠ্য।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

বাংলার স্ত্রী-আচার—ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী সংকলিত। বিশ্বভারতী। দাম ১।০।

ডীন ইং নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ বহুদিন আগে, অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে হিন্দুদের বাঁচা, মরা ও পাপকর্ম সবই ধর্মমতে হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ হিন্দুদের গোটা জীবনযাত্রাটাই

ধর্মের অনুশাসন দিয়ে বাঁধা। আসল ব্যাপারটা ডীন ইং-এর সম্যক উপলব্ধিই হয়নি। হিন্দুদের জীবনযাত্রার মধ্যে ধর্মের চাইতে লোকাচারের অংশই বেশি। এ কথাও আমাদের মনে হয় যে ধর্ম ও লোকাচার দুটি আলাদা জিনিস তা বটেই, এমন কি তাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এতদূর পর্যন্তও সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য নয় যে সেই সর্বজন-বিদিত নব্য খ্রীষ্টান যে বলেছিল 'খ্রীষ্টান হইছি তো হইছি, তাই বইল্যা বাপ-পিতেমোর ধম্ম ছাড়ুম ক্যান?'—তারই মতো আমাদের পিতৃপুরুষদের মনেও একসময় এই সংশয় উপস্থিত হয়েছিল যে আর্যদের এই মন-গড়া ধর্ম, যেটাকে ঠিক ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা যাচ্ছে না, এরই জন্য হাতের পাঁচ পুরোন লোকাচারগুলোকে একেবারে ছেড়ে দেওয়াটা কি বুদ্ধির কাজ হবে? পিতামহরা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চিরকাল যে-সব বিধি-ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন, থাকুক না সেগুলিও। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বা সম্পর্ক না থাকায় বিরোধেরও কোনো কারণ ঘটল না। থেকে গেল কতক কতক।

ফলে এই দাঁড়াল যে পাঁচশাত শ' বছর কেটে গেলে, আনকোরা নতুন আর্যধর্মটাও যখন গা-সওয়া হ'য়ে এল, তখন সাধারণ লোকের মনে কোনটা যে ধর্মের অনুশাসন, আর কোনটা যে প্রাক্-আর্য যুগের নিয়মাবলীর ধ্বংসাবশেষ, সে বিষয় কোন স্পষ্ট ধারণা রইল না। হিন্দুমতের বিয়ে ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম এক-একটা বিরাট অনুষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়াল। আর বিয়ের সময় দেখা গেল হোমানলের সামনে মন্ত্রোচ্চারণের চাইতে, সম্প্রদানের আরো যে-সব মনোহর স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিকেই আত্মীয়কুটুম্বদের ঝোঁক বেশি।

বিয়ে-বাড়িতে পুরুতঠাকুর এসে কি মন্ত্র পড়ালেন না পড়ালেন, তাতে মহিলাদের বড় একটা এসে যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, ও-সব সংস্কৃত মন্ত্রের মানেও কেউ বোঝে না, আর ভুলচুক দু'একটা যদি হ'য়েই যায়, সেটুকুকে সবাই মার্জনা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু স্ত্রী-আচারের বেলা অন্য কথা। সেখানে এতটুকু ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রীতির প্রচলন থাকাতে, বিয়ে-বাড়িতে পাশ্চাত্রেণীর গৃহিণীদের মধ্যে মতভেদেরও প্রচুর সুযোগ থাকে। ফলে, আধা-বয়সীদের মান-অভিমানে বিয়ে-বাড়ির অন্দরমহল সরগরম হ'য়ে ওঠে। লাখ কথার কমে কি কখনো বিয়ে হয়?

বর্তমান পুস্তিকাখানি এক্ষেত্রে বিয়ে-বাড়ির কর্মকর্তীদের অশেষ সহায়তা করবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন আশঙ্কাও হয় যে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত নিয়মাবলী, উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার নিয়মাবলী, পূর্ববঙ্গের ঢাকার নিয়মাবলী আর ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা অঞ্চলের নিয়মাবলী, এই চারি শ্রেণীর স্ত্রী-আচার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণিত থাকায় বিরোধেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তবে বিরোধের অবকাশ থাকলেও ভুলের সুযোগ নেই। চারজন অভিজ্ঞা গৃহিণী, তাঁদের নিজেদের বাড়িতে স্ত্রী-আচার যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, স্পষ্ট ভাষায় তার হুবহু বিবরণী দিয়েছেন।

স্ত্রী-আচারের কারণ খুঁজতে হয় না, কাজেই কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অনুষ্ঠানের কারণ দেখানো হয়নি। কারণ নেই বটে, কিন্তু তাই ব'লে যে অর্থও নেই, একথা যেন কেউ মনে না করেন। আসলে অর্থের দিক থেকে গেলে মঙ্গল-অনুষ্ঠান মাত্রেরই একটিমাত্র অর্থ ও একটি মাত্র উদ্দেশ্য, সে ধর্মানুষ্ঠানই হোক কি স্ত্রী-আচারই হোক, এবং সেটি হলো পাত্র-পাত্রীর অনন্ত সুখের বিধান। তার জন্য স্নেহানুগত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দেবতাদের তুষ্ট

করতে, বিঘ্নশীল 'দানো'দের পরাস্ত করতে ও যাবতীয় মানুষ-শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে, যা কিছু করণীয়, তার কোনোটাই বাকি রাখতে ইচ্ছুক নন।

এই সব কারণে বইখানি আকর্ষণীয়। মুখপত্রে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর অননুকরণীয় রসালাপ থেকে শুরু ক'রে, পরিশেষের বিয়ের গানগুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটি পংক্তি উপভোগ্য। আরেকটা কথা আছে। কুসংস্কার ব'লে অনেকে স্ত্রী-আচারকে অবজ্ঞা ক'রে থাকেন। এই বই পড়েই জানা যায় যে এসব অনুষ্ঠানের কার্যকরী দিকটা বাদ দিলেও, আরেকটি মনোহর দিকও আছে, সেটি হলো শিল্পের দিক। যে জন্য কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে মানুষ ঘরদোর সাজায়, নিজেরা সাজগোজ করে, সেই কারণেই বিয়ে-বাড়িতে মেয়েরা ঘট বসিয়ে, আলপনা দিয়ে, প্রদীপ জেবলে, শাঁখ বাজিয়ে, বরণডালা গুছিয়ে, নিজেরা সেজে-গুজে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

স্ত্রী-আচারের মধ্যে কতরকম মজার কথাই না আছে, পুরুষ-পাঠক তার কতটুকু রসোপলব্ধি করবেন জানি না। আনন্দ-নাড়ু কোটা, শ্রী গড়া, মোনামুনি ভাসানো, শরকাঠি দিয়ে বর মাপা, নিদ্রা-কলস ভরা, বই ফিরা ইত্যাদি আচারের কথা শুনলেও মন খুশি না হ'য়ে পারে না। বাস্তবিক স্ত্রী-আচার সম্পর্কিত এমন একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ বই আদ্যোপান্ত সোৎসাহে পাঠ না ক'রে থাকা যায় না। আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' থেকে নেওয়া ছোট ছোট নক্‌শাগুলি বইখানিকে আরো আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

লীলা মজুমদার

কুমারী কন্যা—দীপক চৌধুরী। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

ধূলোমাটি—ননী ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

বেগমবাহার লেন—বারীন্দ্রনাথ দাশ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

উপন্যাস রচনায় কোনো বিকল্প রীতি আজও অননুসৃত। যদিও পরিবেশন পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন অদ্যনা উল্লেখযোগ্য, তবু মৌল বিষয়ে তা' কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। একথা সর্বজনস্বীকৃত, উপন্যাসে চরিত্র-বিস্তার কেবলমাত্র অনুষঙ্গ নয়। প্রধান। তত্ত্বগত আলোচনায় অবশ্যই উপন্যাস-এর যাথার্থ্য পরিমাপ অসম্ভব। কিন্তু মোটা একটি ফ্রেম যেখানে আছে, তার বাইরে যাওয়াও কেমন বেমানান। বিশেষত উপন্যাসের ক্যানভাস যেখানে বড়, সেখানে অবশ্য-দ্রষ্টব্য যে হাল্কা রঙ-এর সঙ্গে গাঢ় রঙ ঠিক মিলেছে কি-না।

"কুমারী কন্যা" দীপক চৌধুরীর সাম্প্রতিক উপন্যাস। গ্রন্থটিতে তিনি একটি অত্যন্ত সাবেকী সমস্যা তুলে ধরেছেন। এবং যেহেতু এমনতরো সমস্যার সঙ্গে সমাজের যোগ নেই, সে-কারণে তা' ব্যক্তিজীবনের মানসিকতায় সীমাবদ্ধ। ফলে এবিষয়ে লেখক সাহিত্যকর্মের চেয়ে মনঃসমীক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বেশী।

আদিনাথ মল্লিকের কন্যা সুলতা। যার জন্ম-বৃত্তান্তর খোঁজ পাওয়া যায় বাঁকা

রাস্তার অন্ধকারে। উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করার পর তার বিয়ে হল সনতের সঙ্গে। কিন্তু তা' স্থায়ী হয় না। অথচ সনৎ বা সুলতা মনের দিক থেকে কেউ কারো দূরবর্তী নয়। এর পর স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আদিনাথবাবু ও সুলতা দার্জিলিং-এ এলেন। সেখানে তাদের সঙ্গে আলাপ হল ডাক্তার দাশের। এবার নতুন করে আবার নিজের দিকে তাকাল সুলতা। দেখল কখন যেন ডাক্তার দাশের আসন সেখানে পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার দাশ আর অগ্রসর হতে পারলেন না। কারণ সনৎ ততদিনে অস্বাস্থ্য ও শীর্ণতা নিয়ে দার্জিলিং-এ এসে পৌঁছেছে।

এই ঘটনা, যা-কে নানাভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন দীপক চৌধুরী। কিন্তু কোথাও যেন তিনি মূল সূত্রটি খুঁজে পাননি। তাই অবশেষে বিবাহ-সম্পর্ক তাঁর কাছে 'স্যাক্রামেণ্ট।' ফলে উপন্যাসের কোথাও পরিপাট্য দেখা গেল না। মনে হল, শুধু ভঙ্গী দিয়েই বুঝি তিনি পাঠকের মনোহরণে সচেষ্ট। আর, ভাষা-বিন্যাসে ত্রুটি ও শব্দযোজনায় ভ্রান্তির ফলে বইখানি আগাগোড়া পড়ে শেষ করা অত্যন্ত ধৈর্যসাপেক্ষ।

যতদূর স্মরণ করতে পারি, "ধূলোমাটি" ননী ভৌমিকের প্রথম উপন্যাস। দীপক চৌধুরীর মত ননী ভৌমিক সমাজবিমুখ নন। বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে-সময় দানা বাঁধে, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু তার উপন্যাসের সুরু ফিরিঙ্গী পুকুর দিয়ে সুরু করা হয় কেন? সম্প্রতি এক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, যে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক-ই তাঁদের ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় দিতে তৎপর। এর কারণ অনুধাবন ব্যর্থ শ্রম মাত্র। ইতিহাসের এই সুদূরবর্তী প্রেক্ষিত অবশ্যই ক্ষয়িষ্ণু মনের পরিচায়ক। এ-ছাড়া ননী ভৌমিকের লেখায় সর্বত্র এক শ্লথ কল্পনা ছড়িয়ে। যে-শৈথিল্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষায় কোনমতেই সংহত করা সম্ভব হয়নি। শিবু, বীরু, অরুণ এমনকি প্রাণ কারও চরিত্রই বিস্তার লাভ করেনি। মনে হয় একটি শীর্ণ বিন্দুকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি বারে বারে আবর্তিত হয়েছে। এমন কি রামচন্দ্রবাবুর চরিত্রও সুস্পষ্ট নয়।

ভাষা ব্যবহারে সাম্প্রতিক অন্যান্য অনেক লেখকের মত ননী ভৌমিকও যথেষ্ট অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,.....যেন কোনো দ্রুতচ্চারণ মন্ত্র (পৃঃ ৬)। এমন ভুল অনেক আছে।

তবু প্রতিমার চরিত্র ভাল লাগে। প্রতিমাকে মনে হয় আমাদের চেনা এবং জানা। ইয়াসিনের কথা-ও বই পড়ার পরেও আমাদের মনে উঁকি দেয়। কিন্তু লেখায় সংযমের অভাব এত স্পষ্ট যে, এই সুন্দর বিষয়গুলিও চোখ এড়িয়ে যায়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের যে সংক্ষিপ্ত জনসমাজের ওপর দুর্গতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে নেমে এল, তারা আমাদের দেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ। মনে মনে এই সমাজ কুলীন। কারণ তারা জব চার্নক-এর বংশধর বলে পরিচয় দেন। এবং যেহেতু দেহের বর্ণ গৌর (যদিও এর ব্যতিক্রম অধুনা অনায়াস দৃষ্ট), এদেশের কৃষ্ণ সমাজ অপাংক্তেয়। অথচ এখন সর্বক্ষেত্রে ওদের প্রতিযোগিতা। বিশেষ করে চাকুরীর ক্ষেত্রে। যেখানে এক সময় এই বর্ণগুণেই তাদের পথ নিরঙ্কুশ ছিল।

ফলত অনিবার্য ভাবে এই সমাজের অভ্যন্তরের ছিদ্রগুলি গহ্বার আকার ধারণ করেছে।

বারীন দাশের "বেগম বাহার লেন" এই সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। আশা করেছিলাম,

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের এই ক্ষয়ে সমাজভুক্ত মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া কি আকার ধারণ করেছে, তার একটা ছবি পাওয়া যাবে। এই আশা বইখানি পাঠ করবার সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বারীন দাশ যে-সকল চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, হঠাৎ তাদের জীবনের দু' একটা কথা যা' শুনিয়েছেন, তাতে মনে হয়েছে একটি সার্থক, সুন্দর উপন্যাসের এগুলি দুর্লভ উপকরণ। কিন্তু শ্রীযুক্ত দাশ আমাদের আশাভঙ্গের কারণ হয়েছেন। বস্তুত তার লেখকমনের শৃঙ্খলার অভাবে, গ্রন্থটি একটি অপরিণত জার্নাল-এর রূপ নিয়েছে। উপন্যাস হয়নি। আর একেবারে শেষ অধ্যায়ে ঈভার ওই বৃষ্টিভেজা সুন্দর এক ইচ্ছাপূরণের কাহিনী তৈরী করে লেখক প্রমাণ করলেন, চোখটা কেবল তার বাইরেই নিবদ্ধ। ফটক পার হয়ে আর অন্তঃপুরবাসী হতে পারল না।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

পথের সন্ধানে—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। দাম পাঁচ টাকা।
বি কেলাস—অতীন্দ্রনাথ বসু। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। দাম তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ দু'খানির লেখকদ্বয় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে বহুদিন যাবৎ বিশেষভাবে বিজড়িত। স্বভাবতঃই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞ। এ-অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থ দু'খানির আখ্যানভাগ এগিয়ে নিতে উভয় লেখক সচেষ্ট।

রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় জাগ্রতোন্মুখ কতকগুলি চরিত্র অবলম্বনে 'পথের সন্ধানে'র মূল আখ্যায়িকা এগিয়ে চলেছে। এর পটভূমিকা বাংলাদেশের বিবর্তনশীল একটি পল্লী। পল্লী উন্নয়ন, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, জমির মালিকানা এ-গুলি আখ্যানবস্তুর উপলক্ষ্য মাত্র—এ-উপলক্ষ্যগুলিকে কেন্দ্র করে আখ্যানবস্তু যে-দুটি বিপরীত-মুখী শক্তির মুখোমুখি হয়েছে তা হ'লো সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামি আর ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থ ও খ্যাতিলোলুপতার সংগে মোটামুটি উদারপন্থী মানবতাবাদ ও সংগঠনধারার সংঘর্ষ। এ-সংঘর্ষের ঢেউ পল্লীর গণ্ডি ডিঙিয়ে শেষপর্যন্ত শ্রমিক-মালিক সমস্যার মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খানবাহাদুর, আহেদ, বনমালী আর তাঁর সম্প্রদায় এবং গোবর্ধন, ব্রজমোহন, সঞ্জীব, রহিম, রেবা, নলিনী, দরিয়ার প্রভৃতি এই বিপরীতধর্মী দ্বিস্রোতের প্রতীকমাত্র। এমনি বহুতর চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঘটনা-সংকুল কাহিনীটিকে নির্দিষ্ট একটি পরিণতিতে লেখক পৌঁছে দিয়েছেন। যদিচ চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে ও সমগ্র কাহিনীটি পাঠান্তে লেখকের যে-জীবনবোধের আভাস পেলাম তা কাহিনী-আশ্রয়ী হ'য়ে উপন্যাসটির সাহিত্য-রস অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে কিনা এ-সন্দেহে স্বতঃই পীড়িত হ'তে হয়।

তৎসত্ত্বেও লেখকের সাহিত্যনিষ্ঠা প্রকৃতই প্রশংসাযোগ্য। পেশাদার সৃষ্টিধর্মী লেখক না হ'য়েও তিনি কাহিনীটিকে গতিশীল ঝরঝরে ভাষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং আবেগজড়িত হ'লেও যে-জীবনবোধের সন্ধান দিয়েছেন তা' বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যেও বিরলদৃষ্ট।

"বি কেলাস"-এর লেখক কিন্তু হৃদয়ধর্মে বিশ্বাসী হ'য়েও বুদ্ধিজীবী লেখক।

ইতিপূর্বে তাঁর সৃষ্টিধর্মী কোন লেখার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ না ঘটলেও তাঁর বিশ্লেষণধর্মী একাধিক প্রবন্ধের সংগে আমরা পরিচিত। এবং তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হ'লেও বাংলাদেশের স্বল্পসংখ্যক সুচিন্তিত প্রাবন্ধিক ও সমালোচকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

'বি কেলাস' প্রচলিত একটি ধারাবাহিক কাহিনী নয়। কয়েদী-জীবনের খণ্ডবিচ্ছিন্ন কতকগুলি বেদনা-আর্দ্র ছবির গ্রন্থন। ছবিগুলি লেখকের আন্তরিকতায় ও সংযত রেখা-বিন্যাসে আশ্চর্য জীবন্ত। ছবিগুলি যাদের নিয়ে আঁকা হ'য়েছে তারা নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের জীবন তিনি শুধুমাত্র স্পর্শই করেননি, নতুন আলোয় জীবনের নিভৃততম প্রদেশের আলোছায়ার জটিল জটলার মধ্য থেকে বিলীয়মান ছবিটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কোন এক দুর্বল মুহূর্তের মনোবিকলন, সবসময় শুধুমাত্র মনোবিকলনও নয় পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতায় যারা অপরাধী, কারাগৃহের দূষিত ও সংকীর্ণ আবহাওয়ায় সামায়িক বিকৃত মনোভংগী অপসারিত তো হয়ই না উপরন্তু তাদের অবশিষ্ট মনুষ্যত্ব ও সুকুমার জীবনবিশ্বাসও কী ক'রে বেদনাহতভাবে নিঃশেষিত হয় তাই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। তারই সংগে লেখকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অপরাধের মূল সন্ধানে একান্তভাবে সক্রিয়—দার্শনিক চিন্তালোকের ছায়া ধীরে ধীরে অপরাধী থেকে সরে গিয়ে অপরাধের চড়াই-উৎরাইএর ওপর গিয়ে পড়েছে। তাঁর সহানুভূতিশীল অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকোণে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অপরাধের জন্যে যথাযথ দায়িত্ব অপরাধীর পরোক্ষ হ'য়ে গিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অসুস্থতা ও অবক্ষয়ের রূপটি বিশেষভাবে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও বিচিত্রতর চরিত্রের পাশাপাশি লেখকের আলোচনাধর্মী চিন্তাও প্রকাশভংগীর পরিচ্ছন্নতায় সুখপাঠ্য ও সাবলীল।

সুনীলকুমার নন্দী

অন্তঃশীলা—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাক্। দাম সাড়ে তিন টাকা।

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে 'অন্তঃশীলা'র প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'অন্তঃশীলা' এবং তার অনুসৃতিস্বয় 'আবর্ত' এবং 'মোহানা', খুব সীমাবদ্ধ মহলে নতুনত্বের জন্য সেদিন আলোড়ন তুলেছিল। এবং 'অন্তঃশীলা'র বর্তমান সংস্করণের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নূতনত্ব' সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। ভূমিকায় উল্লিখিত এই নতুনত্বের কথা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। এই নতুনত্ব সহজ-সুন্দর ব'লেই নব সংস্করণের 'অন্তঃশীলা' আবার যখন পড়লাম তখনো তার স্বাদ নতুন ব'লে মনে হলো।

'অন্তঃশীলা'র ভাষা ও আঙ্গিকও তাই স্বভাবতঃই নতুন। এর ভাষাকে বীরবলী ও ভঙ্গীকে প্রুস্তীয়ান বলতে আপত্তি করেছেন লেখক। কিন্তু খুব প্রকট না হলেও বীরবল এবং প্রুস্ত উভয়েই যে তাঁর মনে কাজ করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহ।

বর্তমান উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবু। নায়িকা রমলা দেবী, খগেনবাবুর পত্নীবন্ধু। আরো দুটি গৌণ চরিত্র আছে সুজন ও বিজন। একটি উপন্যাসের পক্ষে চরিত্রের এই সংখ্যাল্পতাও লক্ষণীয়।

উপন্যাসের উপলক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। নিছক গল্প আজ আর আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। আজকের বুদ্ধিমান উপন্যাস-পাঠক ঘটনাপ্রবাহের চাইতে প্রবহমান ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপ এবং মানবসম্বন্ধের বিভিন্ন রূপের রূপায়ন দেখতেই অধিকতর আগ্রহী। এবং এই কারণেই উপন্যাস-লেখককে আশ্রয় নিতে হয়েছে নতুন আঙ্গিকের, যে আঙ্গিকে ঘটনার চেয়ে ব্যক্তিকে, ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করা সম্ভব হয়।

খগেনবাবু তথা লেখকের তাই ধারণা : 'সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়ত কোন সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে; তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেসে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হলো pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়।'

এই ধারণাবিশিষ্ট আঙ্গিকেই সহস্রদল শ্বেতপদ্মের উন্মীলনের মতো খগেনবাবুর ব্যক্তিস্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্লেষণমার্গী ব্যক্তিত্ববিশ্বাসী খগেনবাবু পত্নী সাবিত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। এই নিঃসঙ্গতায় সদ্য-ফোটা ফুলের সৌগন্ধের মতো আসেন স্বামী-পরিত্যক্তা রমলা দেবী। রমলা দেবীর সেবা-শুশ্রূষা ও স্নিগ্ধ সাহচর্য খগেনবাবুর বুদ্ধিখর মনে অজ্ঞাতসারে বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। খগেনবাবু আসক্তি বোধ করতে থাকেন রমলা দেবীর প্রতি। আসক্তির লৌকিক হাত থেকে দূরে থাকার জন্যে কাশী চলে যান। কাশী থেকে চিঠি লেখেন রমলা দেবীকে। নিজের ডায়েরী পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে। চিঠি এবং ডায়েরীর মাধ্যমে রমলা দেবী আবিষ্কার করেন খগেনবাবুকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও। অনুভব করেন 'অন্তরের বিরোধের' তীব্রতা। অবশেষে সেই বিরোধ দূরীকরণের ইচ্ছার তাড়নায় কাশীর পথে পাড়ি দেন বন্ধু সুজনের সঙ্গে।

'অন্তঃশীলা'র এই গল্পে কাহিনী-অংশ স্পষ্টতঃই গৌণ। খগেনবাবুর ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং রমলা দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বাহ্যিক রূপ উন্মোচনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্‌ঘাটন-উন্মোচন প্রক্রিয়ায় মৃত পত্নী সাবিত্রীর স্মৃতিও কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল, তারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্মৃতির মাধ্যমে খগেনবাবু আবিষ্কার করেন যে সাবিত্রীর পক্ষে তিনি ছিলেন বৈদান্তিক, সাবিত্রীর বিশেষ অস্তিত্বকে তিনি গ্রহণ করেননি, সাবিত্রীতে বড় করতে চেষ্টা করেছিলেন ভালোবেসে নয়, মাপকাঠি দিয়ে। সাবিত্রীর প্রতি এই অন্যায় তাঁকে বিদ্ধ করতে থাকে। তাই তিনি স্থির করেন : 'এবার যাকে ভালোবাসব তার বিশেষ অস্তিত্ব আমি গ্রাহ্য করব। প্রথমেই গ্রাহ্য করব তার কাছে, কিছু দাবী না ক'রে। দাবী করলেই নিজের ক'রে নেওয়া হলো। দাবী না ক'রে ভালোবাসব। আমার ভালোবাসার জোরেই সে নিজে থেকে পূর্ণ হবে।' 'সমধর্মী' রমলা দেবীর মধ্যে খগেনবাবু আবিষ্কার করেন শান্তি আর সান্ত্বনার শীতল-স্নিগ্ধ উৎস। 'রমলা দেবীর সম্পর্ক সদর্থক'রূপে প্রতিভাত হয় তাঁর কাছে।

স্মৃতিও যে জীবন্ত চরিত্রের মতোই প্রয়োজন হ'তে পারে তার একটি অনন্য প্রমাণ সমালোচ্য উপন্যাসে প্রমূর্ত। বস্তুত সাবিত্রীর স্মৃতি বা স্মৃতির সাবিত্রীও এখানে একটি উল্লেখ্য চরিত্র।

খগেনবাবু, পূর্বেই বলেছি, বিশ্লেষণমার্গী বিদগ্ধ বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ববিশেষ। কিন্তু

তাঁর বুদ্ধিখর মনও শেষে বোধি-ভাত হৃদয়ের কাছে হার মানে। বোধির যে প্রত্যুষে বুদ্ধির প্রদীপ জ্বলে না, জীবনের সেই শুভ্র-শান্ত প্রহরে খগেনবাবুর বেদনা-বিম্ব কণ্ঠ শোনা যায় : 'বুদ্ধির মুখে শতেক উনুনের ছাই পড়ুক। বুভুক্ষু উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিশোধের চাপ আমার কৃত্রিম শুষ্কবুদ্ধি সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে গেল।...মেকীবুদ্ধির ফেরী করতে আর প্রাণ চাইছে না।' এবং যার সংস্পর্শে এসে খগেনবাবুর এই অনুভূতি হলো, সেই রমলা দেবীর কাছে তিনি তাঁর সত্যমূর্তি ধরতে আকুল হ'য়ে ওঠেন।

খগেনবাবু-রমলা দেবীর আসক্তি তথা প্রেম সোচ্চার নয়; নম্র, শান্ত, স্নিগ্ধ। এই আসক্তি উভয়ের কাছেই পূর্ণায়তনে উদ্‌ঘাটিত হয় পারস্পরিক পত্রবিনিময়ে এবং খগেনবাবুর ডায়েরির মাধ্যমে। এই প্রেমের অনুগ্র-সহজ সৌগন্ধ ডায়েরি এবং পত্রগুচ্ছের সর্বত্র সমাকীর্ণ। এবং এই প্রেম সম্ভব হলো কারণ তাঁরা উভয়েই সমব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্ম-সামঞ্জস্যে সুন্দর। উভয়ের ধর্ম আছে, একই চরিত্রের ধর্ম, উভয়েই অভিজ্ঞতা-ধারণে উত্তম-রকমের ক্ষমতাবিশিষ্ট। মনের মৌল গঠন উভয়েরই এক, মনের এই মিল তাই শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মিলনের পথে অগ্রসর হয়।

'অন্তঃশীলা'র আঙ্গিক প্রথাসিদ্ধ নয়, তাই তার ভাষাও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। প্রাণধর্মে বীরবলের প্রতিবেশী। সংলাপ ও স্বগতোক্তিগুলি শাণিত ও ব্যক্তিত্বভাস্বর, কিন্তু 'তাঁকে বীজন করতে লাগলাম'-জাতীয় সংলাপ একটু বেশি সুশ্লীল ও অসহজ ব'লে মনে হয়; কিংবা 'দুজনে যখন বাক্যালাপ করে তখন তৃতীয় ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণ হয়ে ওঠে। কেবল মৌখিক ভাষারই নয়, অব্যক্ত সম্বন্ধের গোপন রীতিও সেই অনস্তিত্বের দ্বারা নিরূপিত হয়'—জাতীয় গদ্য-প্রকরণ অবাঞ্ছনীয়।

এ-জাতীয় ত্রুটি অবশ্য এ উপন্যাসের পক্ষে এমন কিছু নয়। বাংলা উপন্যাস রচনার বাঁধা সড়ক ছেড়ে ধূর্জটিবাবু পাশ্চাত্যপ্রচলিত নতুন যে আঙ্গিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর সাধনা সার্থকতর সিদ্ধির সামীপ্য হয়তো পায়নি, কিন্তু উপন্যাসের হাওয়া-বদলের জন্যও অন্তত সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিকরা যদি এই আঙ্গিকে উপন্যাস রচনা করতে চেষ্টা করেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যের উপকার হবে।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত